BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

হুমায়ুন আজাদ

বুকপকেটে জোনাকিপোকা

www.BDeBooks.Com

হুমায়ুন আজাদ

বুকপকেটে জোনাকিপোকা

আগামী প্রকাশনী

পঞ্চম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০: মে ২০১৩

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১১ অক্টোবর ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৬ জুলাই ২০০৯
চতুর্থ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ জুলাই ২০১১

স্বত্ব হুমায়ুন আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

ISBN 978 984 401 111 3

Bukpakete jonaki Poka (Essays, poems, and stories for the young) by Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
Phone: 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

Fifth Print : May 2013

Price : Tk 120.00 only

www.BDeBooks.Com

উৎসর্গ

প্রিমা প্রতীক অনন্য পারিজা ধীমান স্মিতা রচনা শিউলি বিপু
ও অন্যান্য ভবিষ্যৎ মানুষের
নামে

স্বপ্নের দরোজায় দাঁড়িয়ে

কিশোরকিশোরীদের জন্যে আমি
তিন দশকে লিখেছি কিছু প্রবন্ধ, কয়েকটি কবিতা,
তিনটি গল্প। প্রবন্ধগুলো একটু অন্য
ধরনের; শব্দ, ভাষা, আর কবিতা সম্পর্কে; তাতে স্বপ্নের
কথা আছে বেশি ক'রে। কবিতাগুলোতেও
তাই ; গল্পগুলোতেও। এগুলোকে
এক বইতেই রাখলাম, কেননা এটা স্বপ্নের
বই। এগুলোকে গদ্যে লিখেছি বা ছন্দে লিখেছি,
তবে এগুলো একই স্বপ্নে
লেখা।

হুমায়ুন আজাদ
১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা।
২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২

www.BDeBooks.Com

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

একফোঁটা চোখের জলের মতো শহীদ মিনার ১৩
যে-পুস্তক পাঠ করলে ১৬
শব্দ বানাই ২৩
এসো কবিতা পড়ি ২৯
ওর নাম মেয়ে ৩৩
উটের গ্রীবার মতো ৩৭
এসো কবিতা লিখি ৪১
এক পয়সার বাঁশি ৪৫
লাল নীল ছড়া ৪৭
বুকপকেটে জোনাকিপোকা : শব্দগুলো ৪৯
ছোটো ছোটো পাখি মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন ৫২
শব্দ থেকে কবিতা ৫৬
স্বাধীনতার কথা কেনো আমাদের এতো বেশি মনে পড়ে ৬০
স্মিতামণি ও তার স্মিত হাসি ৬৩

কবিতা

কখনো আমি ৭১
শুভেচ্ছা ৭২
স্বপ্ন ৭৩
ধুয়ে দিলো মৌলির জামাটা ৭৪
ফাগুন মাস ৭৫
দোকানি ৭৬
ইঁদুরের লেজ ৭৭
স্বপ্নের ভুবনে ৭৮

গল্প

মহৎ কৃপণের কাহিনী ৮৫
টাকা দিন ৯১
গাড়লস্তানে এক বিকেল ৯৪

প্রবন্ধ

একফোঁটা চোখের জলের মতো শহীদ মিনার
যে-পুস্তক পাঠ করলে
শব্দ বানাই
এসো কবিতা পড়ি
ওর নাম মেয়ে
উটের গ্রীবার মতো
এসো কবিতা লিখি
এক পয়সার বাঁশি
লাল নীল ছড়া
বুকপকেটে জোনাকিপোকা : শব্দগুলো
ছোটো ছোটো পাখি মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন
শব্দ থেকে কবিতা
স্বাধীনতার কথা কেনো আমাদের এতো বেশি মনে পড়ে
স্মিতামণি ও তার স্মিত হাসি

www.BDeBooks.Com

একফোঁটা চোখের জলের মতো শহীদ মিনার

দুঃখ চোখে জল হয়ে দেখা দেয়। চোখের পাতায় দুঃখ টলমল করে এক ফোঁটা জল হয়ে। শহীদ মিনারের দিকে তাকালে মনে হয় টলমল করছে এক বিন্দু অশ্রু। চোখের জল খুব সুন্দর, দেখতে মুক্তোর মতো; কিন্তু তা দুঃখের মুক্তো। শহীদ মিনারও সুন্দর, কিন্তু অনেক বেদনার। অনেক দীর্ঘশ্বাসের। কার চোখে টলমল করছে ওই দুঃখ, ওই মুক্তো, ওই জলের ফোঁটা? বাঙলাদেশের চোখের পাতায় টলমল করছে ওই জলের ফোঁটা, ওই দুঃখে নীরবে কাঁদছে সবুজ বাঙলাদেশ, তার চোখে টলমল করছে কান্না : শহীদ মিনার বাঙলাদেশের চোখের জল।

কেনো কাঁদে বাঙলাদেশ? বাঙলাদেশ কাঁদে শোকে। বাঙলাদেশ হারিয়েছে তার সুন্দর সুন্দর সন্তান। নাম জানা আর নাম-না-জানা অনেক সন্তান হারানোর শোকে ভ'রে আছে বাঙলাদেশের বুক। তার সন্তানেরা কেউ চাষ করে, কেউ মাছ ধরে, কেউ কারখানায় কাজ করে। তার সন্তানেরা অনেকে ইস্কুলে যায়, কলেজে যায়, অনেকে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাঙলাদেশ ভালোবাসে তার সন্তানদের, তার সন্তানেরা ভালোবাসে তাকে। মা যেমন ভালোবাসে সন্তানকে, সন্তান যেমন ভালোবাসে মাকে। তার সন্তানেরা অনেকে হারিয়ে গেছে অসময়ে। তাদের কথা ছিলো মায়ের কাছে ফিরে আসার, কিন্তু তারা ফিরে আসে নি। তারা ফিরে আসতে পারে নি। তাই বাঙলাদেশের বুকে অনেক দুঃখ। ওই দুঃখই চোখের জল হয়ে শহীদ মিনার হয়ে টলমল করছে।

বাঙলাদেশ এখন স্বাধীন, তার আকাশে একটি পতাকা ওড়ে। বাঙলাদেশের দুটি সূর্য : একটি পূবে উঠে অস্ত যায় পশ্চিমে, আরেকটি কখনো অস্ত যায় না। সেটি তার পতাকায় উদিত হয়ে স্থির হয়ে আছে। আগে এমন ছিলো না, তার পতাকার সূর্যটি তখনো ওঠে নি। বাঙলাদেশ তখন ছিলো আরেকটি দেশের অধীনে। সে দেশের নাম ছিলো পাকিস্তান, তবে সেটি পবিত্র দেশ ছিলো না। পাকিস্তান চেয়েছিলো বাঙলাদেশের ভাষা লোপ ক'রে দিতে। পাকিস্তান চেয়েছিলো বাঙালির বাঙলা ভাষা নষ্ট ক'রে আরেকটি ভাষা চালাতে। বাঙালি বাঙলা বলতে পারবে না, বাঙালিকে

বলতে হবে পাকিস্তানের ভাষা। এর অর্থ হচ্ছে বাঙালি থাকবে না বাঙালি, বাঙালি হবে অবাঙালি, হবে পাকিস্তানি।

বাঙলাদেশের সন্তানেরা তা মেনে নিতে পারে নি। তারা ছিলো ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অনেক স্বপ্ন নিয়ে তারা এসেছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে, কিন্তু তারা দেখতে পায় পাকিস্তান কেড়ে নিচ্ছে তাদের ভাষা। নিজের ভাষা ছাড়া মানুষ কোনো বড়ো কাজ করতে পারে না। নিজের ভাষা হারিয়ে ফেলা হচ্ছে নিজের জীবন হারিয়ে ফেলা। যার নিজের দেশ নেই সে যেমন দুঃখী, যার নিজের ভাষা নেই সেও তেমনি দুঃখী। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তার কোনো স্বপ্নই সফল হয় না। সেদিন বাঙলার সন্তানেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, বুঝতে পারে যে পাকিস্তান তাদের বোবা ক'রে দিতে চায়।

উনিশ শো বায়ান্নো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, আটই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। ঢাকা শহর ছিলো তখন গ্রামেরই মতো। সেই গ্রামেরই মতো শহরে সেদিন মিছিল বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের সাথে যোগ দেয় সাধারণ মানুষ। তাদের সবার মুখে শ্লোগান : রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই। সেদিন নিষেধ ছিলো মিছিল বের করা। কিন্তু তারা নিষেধ মানে নি। পাকিস্তানের দুষ্ট শাসকেরা স্থির করেছিলো রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। বাঙলার কোনো জায়গা থাকবে না। ছাত্ররা তা মেনে নিতে পারে নি। তাই বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে বেরোয় তারা আগুনের মতো মিছিলে। কেঁপে ওঠে কুৎসিত পাকিস্তান।

পাকিস্তানের হিংস্র শাসকেরা বিশ্বাস করতো শুধু বন্দুকে। তারা ভাবতো বন্দুক রক্ষা করবে পাকিস্তানকে। কিন্তু মানুষের ভালোবাসার কাছে বন্দুক পরাজিত হয় চিরকাল। ছাত্রদের মিছিল পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে এগোতে থাকে। 'রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই' শ্লোগানে ফাটল ধরে পাকিস্তানের ভিত্তিতে। এগিয়ে আসে পাকিস্তানি ঘাতকেরা। তারা গুলি চালায় ছাত্রদের মিছিলে। রক্তে লাল হয়ে ওঠে বাঙলাদেশ। সেদিনই বাঙলাদেশের চোখের অশ্রুবিন্দুর মতো দেখা দেয় শহীদ মিনার। খুব ছোটো। সেটি ভেঙে ফেলে পাকিস্তানি ঘাতকেরা। কিন্তু দুঃখের অশ্রুকে কেউ ভাঙতে পারে না, তা মহাসাগরের থেকেও অনেক বড়ো। তাই পরে সেখানে ওঠে আরো বড়ো শহীদ মিনার। বাঙলাদেশের দিকে দিকে চোখের জলের মতো টলমল ক'রে দেখা দিতে থাকে শহীদ মিনারের পর শহীদ মিনার। একুশে ফেব্রুয়ারি বা আটই ফাল্গুন হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গভীর অশ্রুবিন্দুর জন্মদিন।

www.BDeBooks.Com

চোখের জল খুবই কোমল, কিন্তু তা হয়ে উঠতে পারে আগুনের থেকেও লেলিহান। বাঙলাদেশের অশ্রুই হয়ে ওঠে লেলিহান আগুন, যাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পাকিস্তান। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি, আটই ফাল্গুন, যেনো আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জীবনে অনেক পবিত্র দিন রয়েছে, কিন্তু শহীদ দিবস আমাদের শ্রেষ্ঠ দিন। এদিন যে-আবেগ জাগে, তা জাগে না অন্য কোনো দিন। কারণ এদিনেই প্রথম বাঙলাদেশের বুকের ভেতর থেকে এসে চোখের পাতায় জমেছিলো দুঃখের ফোঁটা। জন্ম নিয়েছিলো শহীদ মিনার।

বায়ান্নো থেকে এই অশ্রুবিন্দুই হয়ে উঠেছে বাঙালির তীর্থ। বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারিতে খালি পায়ে যায় এই তীর্থে। তার বুক থেকে ওঠে বেদনার গান। ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেয় চোখের জলকে। আবার এই অশ্রুবিন্দু থেকেই বাঙালি সংগ্রহ করে আগুন, আগুনের মতো সাহস। বাঙালি যখন প্রতিবাদ করতে চায়, তখন যায় এই এক ফোঁটা চোখের জলের কাছে। বাঙালি যখন অধিকার চায়, তখন যায় এই অশ্রুবিন্দুর কাছে। বাঙালি যখন স্বাধীনতা চায়, তখন যায় এই চোখের জলের কাছে। বাঙালি যখন দানবদের তাড়াতে চায়, তখন যায় এই অশ্রুবিন্দুর কাছে। বাঙালি এই একফোঁটা চোখের জলের কাছে ফিরে ফিরে যায়। জাগরণে যায়, স্বপ্নে যায়। শহীদ মিনার একবিন্দু টলোমেলো অশ্রু। আবার এই অশ্রুই হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি। শহীদ মিনার : বাঙালির অশ্রু ও আগুনে গড়া তীর্থ।

যে-পুস্তক পাঠ করলে

খুব ছোটোবেলা খুব নিচু শ্রেণী থেকে একটি বই পড়তে হয় সকলের। বইটি পড়তে অনেকের নাকি ভালোই লাগে না। ছড়া নেই, ছবি নেই, আছে অনেক নিয়মকানুন। বইটির নাম ব্যাকরণ। ব্যাকরণ যাঁরা লেখেন, শুরুতেই তাঁরা বইটি সম্পর্কে একটি বেশ বড়ো কথা বলেন। তাঁরা, একটু অন্যরকম ভাষায়, বলেন : যে-পুস্তক পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, তার নাম ব্যাকরণ। শুদ্ধ কথাটির ওপর তাঁরা খুব জোর দেন, এবং সব সময় চান শুদ্ধতা। ব্যাকরণ প'ড়ে কেউ শেখে না কথা বলতে, কথা বলার একরকম বিস্ময়ভরা শক্তি নিয়েই মানুষ আসে পৃথিবীতে। যদি ব্যাকরণ প'ড়ে শিখতে হতো কথা বলা, তবে কথা বলা আর শেখা হতো না আমাদের।

ব্যাকরণের সাহায্যে আমরা শিখি লিখতে ও পড়তে এবং বলতে; শুদ্ধরূপে। সারাদিন যতো কথা বলি আমরা, তাতে বেশ কাজ চলে; কিন্তু তার সবটা শুদ্ধ নয়। 'আমি যাবো' বলতে গিয়ে যদি বলে ফেলি 'আমি যামু' তবে ধমক দেন আব্বু ভাষা অশুদ্ধ হচ্ছে বলে। 'মানুষ" লিখতে গিয়ে 'মানুশ' লিখলে বানান অশুদ্ধ হয়েছে বলে রাগ করেন স্যার। ব্যাকরণ ভরেই শুদ্ধ-অশুদ্ধ কথাগুলো সবচেয়ে মিষ্টি গানের সুরের মতো ফিরে ফিরে আসে।

প্রথম যাঁরা ব্যাকরণ লিখেছিলেন পৃথিবীতে, তাঁদের ধারণা ছিলো পৃথিবীটা দিনদিন অশুদ্ধ হচ্ছে। অশুদ্ধ হচ্ছে মুখের ভাষা, অশুদ্ধ হচ্ছে সমাজ-রাষ্ট্র, অশুদ্ধ হচ্ছে আরো অনেক কিছু। তাঁরা মনে করতেন মানুষের ভাষা আগে ছিলো শুদ্ধ ও পবিত্র, কিন্তু তা দিনদিন মুখেমুখে ব্যবহৃত–ব্যবহৃত হয়ে নষ্ট হয়, ও হচ্ছে। ভাষা যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, তারই জন্যে তাঁরা লিখেছিলেন ব্যাকরণ বই।

পুরোনো ভারতের একটি পবিত্র বইয়ের নাম *বেদ*। এটি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। বেদে বিশ্বাসীরা মনে করতো যে বেদের ভাষা ঈশ্বরের মুখেরই ভাষা। তাই ওই ভাষা পুণ্য পবিত্র স্বর্গীয়। কিন্তু এক সময় এমন হল যে চারপাশে কেউ আর ওই পবিত্র ভাষা বলে না; বলে এমন ভাষা, যার সাথে সামান্য মিল আর অনেক অমিল বেদের ভাষার। পবিত্র ভাষা যাতে নষ্ট অপবিত্র অশুদ্ধ হয়ে না যায়, তারই জন্যে পণ্ডিতেরা লিখলেন প্রথম ব্যাকরণ। একই রকম ব্যাপার ঘটেছিলো পশ্চিম ইউরোপে। জিশুর জন্মের

www.BDeBooks.Com

তিনশো বছর আগে মিশর ছিলো গ্রিসের অধীনে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বিখ্যাত শহর, সেখানে মিলিত হয়েছিলেন অনেক গ্রিসীয় পণ্ডিত।

হোমার হলেন পুরোনো গ্রিসের মহাকবি, যাঁর দুটি বিখ্যাত মহাকাব্য *ইলিআড, অডেসি*। আলেকজান্দ্রিয়ার ভাষায় উৎসাহী পণ্ডিতেরা দেখলেন যে হোমারের কবিতার ভাষা মানুষের মুখেমুখে অনেক বদলে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা ছিলো মহাকবি হোমার অনেক আগে যে-ভাষায় রচনা করেছিলেন তাঁর মহাকাব্য, তা ছিলো স্বাভাবিকভাবেই শুদ্ধ পবিত্র নির্মল। হোমারের ভাষার শুদ্ধরূপ কী ছিলো, তা আবিষ্কার করতে গিয়েই আলেকজান্দ্রিয়ায় লেখা হয় ইউরোপের প্রথম ব্যাকরণ। গ্রিসীয় ভাষার ব্যাকরণ। ভারতে প্রথম, সবার আগে, কে ব্যাকরণ লিখেছিলেন? তা জানে না কেউ, তাঁর নাম হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইউরোপের গ্রিসীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণলেখকের নাম জানি আমরা। নাম তাঁর দিওনীসিউস থ্রাকস। তাঁর ব্যাকরণের নাম *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি*। এর অর্থ হলো 'বর্ণবিদ্যা' : বর্ণ বা অক্ষর সাজানোর বিদ্যা।

আগের ব্যাকরণলেখকেরা শুদ্ধতার ওপর জোর দিতেন পাতায় পাতায়, এবং অশুদ্ধতাকে শাসন করতেন পংক্তিতে পংক্তিতে। তাঁরা জারি করতেন শুদ্ধাশুদ্ধির আইন। বলতেন 'কেবলমাত্র' বলা অশুদ্ধ, বলতে হবে 'কেবল', বলতেন 'একত্রিত' বলা চলবে না, কেননা ও-শব্দটি অশুদ্ধ, বলতে হবে 'একত্র' যেহেতু এটি শুদ্ধ। বলতে হবে 'সুন্দরী মেয়ে', বা 'প্রবাহিতা নদী', বলা যাবে না 'সুন্দর মেয়ে', বা 'প্রবাহিত নদী', কেননা এগুলো, তাঁদের মতে, অশুদ্ধ। তাঁদের দেয়া অনেক নিয়ম আজ আর মানা হয় না; কেননা সময়ের বদলে নিয়মেরও বদল ঘটে। তাঁদের ব্যাকরণের পাতায় পাতায় পাওয়া যায় নির্দেশ বা অনুশাসন। তাই ওই ব্যাকরণকে বলা হয় *আনুশাসনিক ব্যাকরণ*।

আনুশাসনিক ব্যাকরণ বেশ কঠিন নাম : এর কাজ হলো ভাষায় কী শুদ্ধ আর কী অশুদ্ধ সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া। নতুন একরকম ব্যাকরণ বেরোয় আধুনিক কালে। ওই ব্যাকরণ নির্দেশ দেয় না, বলে না এটা শুদ্ধ ওটা অশুদ্ধ। ভাষায় যা ঘটে, এ ব্যাকরণ তার বর্ণনা দেয় শুধু। এ-ব্যাকরণের নাম *বর্ণনামূলক ব্যাকরণ*; বেশ কঠিন এ-নামটিও। এ-ব্যাকরণ 'সুন্দর মেয়ে' পদটিকে ভুল বলবে না, 'সুন্দরী মেয়ে'কেও বলবে না শুদ্ধ। শুধু বলবে যে আজকের বাঙলা ভাষায় দুটোই ব্যবহৃত হয়। তবে 'সুন্দরী মেয়ে'র চেয়ে অনেক অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় 'সুন্দর মেয়ে' পদটি। কিছুদিন আগে, ১৯৫৭ সালে, আবিষ্কার করা হয় নতুন একরকম ব্যাকরণ।

এর নাম *রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ*। এ-ব্যাকরণই সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে ভালো।

পুরোনো ভারতকে বলতে পারি ব্যাকরণের দেশ। কয়েক হাজার বছর আগে পুরোনো ভারতে দেখা দিয়েছিলেন অসংখ্য ব্যাকরণলেখক, আর লেখা হয়েছিলো সংখ্যাহীন ব্যাকরণ বই। *বেদ*-এর ভাষা ঘিরেই জন্মেছিলেন ওই ব্যাকরণবিদমণ্ডলি। তাঁরাই ওই ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন তন্নতন্ন ক'রে। চার রকম বই লিখেছিলেন তাঁরা। একরকম বইয়ের নাম *শিক্ষা*। *ব্যাকরণ* বইতে আলোচিত হতো বেদের ভাষার শব্দ শুদ্ধরূপে তৈরি করার কৌশল। তৃতীয় একরকম বইকে বলা হয় *নিরুক্ত*। নিরুক্তর কাজ ছিলো ওই ভাষার শুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা করা। চতুর্থ শ্রেণীর বইগুলোকে বলা হয় *ছন্দ* : এ-বইতে ওই ভাষা শুদ্ধ ভঙ্গিতে পড়ার নিয়ম বর্ণনা করা হতো।

বেদের ভাষার নাম বৈদিক। এ-ভাষার সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেছিলেন পুরোনো ভারতের ব্যাকরণবিদেরা। তাঁদের বর্ণনা এতো উন্নত, যার কোনো তুলনা পুরোনো পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তাঁরা ভাষা বর্ণনা করার যে-সব কৌশল বের করেছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে, সে-সব কৌশলই আজো বাঙলা ভাষা বর্ণনার সময় ব্যবহার করেন বাঙলা ব্যাকরণলেখকেরা।

বৈদিক, বা সংস্কৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখকের নাম পাওয়া যায় না। তবে এ-ভাষার যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণলেখক, তাঁর নাম পাণিনি। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পুরোনো ভারতের সালাতুর নামক স্থানে। সালাতুর-এর বর্তমান নাম লাহোর। পাণিনির ব্যাকরণ বইয়ের নাম *অষ্টাধ্যায়ী*; অর্থাৎ এমন বই, যাতে আছে আটটি অধ্যায়। পাণিনির আগে, অনেক আগে, আরো অনেকে লিখেছিলেন বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ। তাঁদের কয়েকজনের নাম হচ্ছে যাস্ক, শাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ্য, গালব, স্ফোটায়ন। যাস্ক-এর বইয়ের নাম *নিরুক্ত*। অর্থাৎ পাণিনির জন্মের অনেক আগের থেকেই পুরোনো ভারতে ব্যাকরণ রচিত হচ্ছিলো। তাঁরা ভাষার ব্যাখ্যার জন্যে বের করেছিলেন অনেক চমৎকার কৌশল। কিন্তু পাণিনি ছাড়া আর কারো বই আমাদের হাতে এসে পৌঁছে নি। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* মহৎ বই : এ-বইয়ের সমতুল্য আর কোনো ব্যাকরণ বই নেই সারা পৃথিবীতে। ব্যাকরণলেখক হিশেবে পাণিনি খুব বড়ো ও বিখ্যাত; কিন্তু আরো তিনজন বড়ো ব্যাকরণবিদ ছিলেন পুরোনো ভারতে। তাঁরা হলেন কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি।

www.BDeBooks.Com

পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীকে* বলা হয় মানুষের মেধার চরম বিকাশের উদাহরণ। এ-বইয়ের আটটি অধ্যায়ে তিনি সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষার সমস্ত শব্দ তৈরির নিয়ম রচনা করেছেন। এ-নিয়মগুলোকে বলা হয় সূত্র। অষ্টাধ্যায়ীতে আছে আটটি অধ্যায়। আট অধ্যায়ে আছে চার হাজার সূত্র, যার সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার সমস্ত শব্দ বানানো যায়। পাণিনির পরে দেখা দেন পাণিনির সমালোচক কাত্যায়ন। কাত্যায়ন ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মানুষ। তিনি পাণিনির অনেক নিয়মের ত্রুটি ধরেন, এবং সে-নিয়মগুলো সংশোধন করেন। কাত্যায়ন পাণিনির দেড় হাজার সূত্রের ভুল ধরেন, ও নতুন সূত্র দেন। কাত্যায়নের পরে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই *মহাভাষ্য* নামে বই লেখেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলি ভুল ধরেন কাত্যায়নের, এবং পাণিনিকেই নির্ভুল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি জন্ম নেন অনেক পরে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে। তিনি লেখেন *বাক্যপদীয়* নামে একটি ছন্দে লেখা বই।

তখন গ্রিসের অধীনে ছিলো পুরোনো মিশর। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থাপিত হয় একটি বিশাল পাঠাগার, যেখানে রাখা হয়েছিলো গ্রিসের অমর দার্শনিক আরিস্ততলের বইপত্র। এ-আলেকজান্দ্রিয়া পরিণত হয়েছিলো জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বড়ো কেন্দ্রে। আলেকজান্দ্রিয়ায় লেখা হয়েছিলো দুটি অমর বই : একটি হচ্ছে জ্যামিতিবিদ ইউক্লিডের *এলিমেন্টস* অন্যটি দিওনীসিউস থ্রাকস-এর *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি।*

থ্রাকস খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের অধিবাসী। থ্রাকসের বইটি খুব ছোটো। মাত্র পঁচিশটি ছোটো অনুচ্ছেদে রচিত হয়েছিলো গ্রিসীয় বা গ্রিক ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। বইটি ছোটো হলেও প্রভাব ছড়িয়েছিলো খুব। গত দুহাজারেরও বেশি বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণলেখকরা থ্রাকসকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন নানাভাবে। থ্রাকস কিন্তু গ্রিসীয় ভাষার সব দিকের ব্যাকরণ লেখেন নি; তিনি লিখেছিলেন ধ্বনি ও শব্দের ব্যাকরণ। তাঁর কালেই আরেকজন ব্যাকরণবিদ, নাম যাঁর আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস, লেখেন গ্রিসীয় ভাষার বাক্যের ব্যাকরণ। এ-বইও প্রভাব ছড়িয়েছিলো অনেক।

গ্রিসবাসীরা স্রষ্টা, আর রোমের অধিবাসীরা অনুসরণ ও অনুকরণকারী। জ্ঞানের সব জায়গাতেই দ্বিতীয়রা অনুকরণ করেছে প্রথমদের। ব্যাকরণ রচনায়ও হয়েছে তাই। রোমের পণ্ডিতেরা ভাষা বিশ্লেষণের কৌশল শেখেন গ্রিসীয় ভাষার ব্যাকরণ প'ড়ে। ব্যাকরণ উৎসাহিত করেছিলো রোমের অনেককে।

একনায়ক জুলিয়াস সিজারও একটি ব্যাকরণ বই লিখেছিলেন পুরোনো ফরাশিদেশ দখলের সময়। রোমের ভাষার নাম লাতিন, বা ল্যাটিন। এ-ভাষার যিনি সবচেয়ে বড়ো আর বিশ্বস্ত ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাঁর নাম প্রিসকিআন। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মানুষ। তাঁর ব্যাকরণের আছে আঠারোটি খণ্ড। প্রথম ষোলো খণ্ডে তিনি লাতিন ভাষার শব্দ তৈরির নিয়মকানুন রচনা করেছেন, আর শেষ দু-খণ্ডে ব্যাখ্যা করেছেন লাতিনের বাক্যগঠনের সূত্র। তাঁর ব্যাকরণও পরবর্তী ইউরোপীয় ব্যাকরণলেখকদের প্রভাবিত করেছিলো খুব।

পুরোনো ভারতে 'ব্যাকরণ' শব্দটি বেশ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হতো। শুদ্ধ শব্দ তৈরি করার নিয়মকানুন শেখায় যে-বই, তাকেই তখন বলা হতো ব্যাকরণ। পতঞ্জলি, ভারতের তৃতীয় বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ, ব্যবহার করতেন অন্য একটি নাম; তিনি ব্যাকরণকে বলতেন *শব্দানুশাসন।*

আজকাল ব্যাকরণ শব্দটির অর্থ বেড়ে গেছে অনেকখানি। শুধু শব্দ, অর্থ বা ধ্বনি নয়, ভাষার সমস্ত কিছুই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করে যে-বই, তাকে আজকাল বলা হয় ব্যাকরণ। বাঙলা ব্যাকরণ প্রথম কখন লেখা হয়, কে লেখেন বাঙলা ব্যাকরণ সবার আগে? অবাক লাগবে শুনতে যে কোনো বাঙালি সবার আগে লেখেন নি বাঙলা ব্যাকরণ। বাঙলা ব্যাকরণ সবার আগে লিখেন যিনি, তিনি বিদেশি। নাম তাঁর মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ। তিনি পর্তুগিজ। বাড়ি ছিল তাঁর পর্তুগালে। পাদ্রি মনোএল দ্য অসসুম্পসাঁউ ধর্মপ্রচারের জন্যে এসেছিলেন এ-দেশে; আর এ-দেশের কয়েকজন সহায়কের সাহায্যে লিখেছিলেন বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। বইটি কিন্তু বাঙলা ভাষায় লেখা নয়।

বইটির পর্তুগিজ নাম *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেংগল্লা, এ পোর্তোগিস,* যার অর্থ হচ্ছে *বাঙলা ও পর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ, বা অভিধান।* বইটি দু-ভাষায় লেখা : *পর্তুগিস* ভাষায়, ও রোমান লিপিতে লিখিত বাঙলা ভাষায়। বইটির দুটি ভাগ। বইটির শুরুতে আছে ছোটো ব্যাকরণ অংশ, তারপরে আছে বেশ দীর্ঘ অভিধান অংশ। বইটি লিখিত হয়েছিলো ভাওয়ালে ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে, *লিসবন* শহরে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেন বাঙলায় *পাদ্রি মনোএল-দা-আসসুম্পসাঁম রচিত বাঙলা ব্যাকরণ* নামে। এরপরেও অনেকদিন ধরে বিদেশিরাই লেখেন বাঙলা ব্যাকরণ বিদেশি ভাষায়, তাঁদের নিজেদের দরকারে।

১৭৭৮-এ বেরোয় ন্যাথানিএল ব্র্যাসি হ্যালহেড-এর *গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ,* ইংরেজি ভাষায়। এ-বইটি স্মরণীয় হয়ে আছে একটি

www.BDeBooks.Com

বড়ো কারণে। এ-বইটিতেই প্রথম বাঙলা ভাষা ছাপা হয় বাঙলা অক্ষরে আধুনিক রীতিতে। ইংরেজরা লিখেছিলেন বাঙলা ভাষার অনেক ব্যাকরণ। উইলিয়ম কেরির *গ্রামার অব দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ* প্রকাশিত হয় ১৮০১-এ ; হটন-এর *রুডিমেন্টস অব বেংগলি গ্রামার* ছাপা হয় ১৮২১-এ, লণ্ডনে। আরো অনেক ইংরেজ ইংরেজিতে লিখেছিলেন বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ। এঁদের মধ্যে আছেন ফোরবেস (১৮৬২), নিকল (১৮৮৫), বিমস (১৮৯৪), এবং আরো অনেকে। বিদেশিরা বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ ভাষার ব্যাকরণের আদলে।

বাঙালিদের মধ্যে যিনি সবার আগে লেখেন বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ, তাঁর নাম রামমোহন রায়। তাঁর *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* বেরোয় ১৮৩৩-এ, লেখকের মৃত্যুর পর। তারপর গত দেড়শো বছর ধরে অনেক বাঙালি লিখেছেন অনেক বাঙলা ব্যাকরণ। বাঙালিরা যখন বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লেখায় মন দেন, তখন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই বাঙলা ভাষাকে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া সংস্কৃত বলে মনে হয়। তাই নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মেয়েকে শুদ্ধ করার জন্যে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার নিয়মকানুন জোর ক'রে নিয়ে আসতে থাকেন। বাঙলা ভাষার শরীর ভরে পরিয়ে দেয়া হয় সংস্কৃত পোশাক আর অলঙ্কার। তাতে বাঙলা ভাষার বাঙলাত্ব মুছে যায় অনেকখানি, তার শোভা কমে যায় বেশখানি। আজো আমাদের দেশে এমনভাবেই লেখা হয় বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ।

উনিশশতকে অনেক বাঙালিই লিখেছিলেন বাঙলা ব্যাকরণ। রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। রামমোহন রায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন বাঙলা ব্যাকরণকে, ও বাঙলা ভাষাকে। কিন্তু তারপরে যে-বাঙালিরা বাঙলা ব্যাকরণ লেখেন, তাঁরা বাঙলাকে কখনো সংস্কৃতের মতো কখনো ইংরেজির মতো বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাঁদের লক্ষ্য ছিলো বিদ্যালয়ের ছাত্ররা; তাঁরা লিখতেন ছাত্রদের জন্যে। তাই বাঙলা ভাষার গভীর ও জটিল ব্যাখ্যায় না গিয়ে কতকগুলো ধরাবাঁধা বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করতেন তাঁরা। পদপরিচয়, সন্ধি, সমাস, কারক, প্রকৃতি, প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিৎ প্রভৃতি আমাদের ব্যাকরণ লেখকদের প্রিয় বিষয়। তাঁরা সবাই একই রকমে একই কথা বলেন, নতুন কোনো কথা বলেন না। শুদ্ধতা শেখাতে গিয়ে অনেক সময় শেখান অশুদ্ধতা।

উনিশ-বিশ শতকে যে-বাঙালিরা বাঙলা ব্যাকরণ লিখে নাম করেছেন তাঁদের কয়েকজন : শ্যামচরণ সরকার (১৮৫০), দেবীপ্রসাদ রায় (১৮৫৪),

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (১৮৭৮), নীলমণি মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮), প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৮৪), কে পি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩), যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১৯), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৩০৫), হরনাথ ঘোষ (১৯৩৭), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৪২)। এঁরা ব্যাকরণ লিখেছেন প্রথাসম্মত উপায়ে, কারো ব্যাকরণ হয়েছে ভালো, কারোটা মন্দ ; কেউ লিখেছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে, কেউ ইংরেজির আদলে, কেউ লিখেছেন ইংরেজি ও সংস্কৃতের আদলে। তাই তাঁদের ব্যাকরণ বাঙলা ভাষার গভীর নিয়মকানুন বের করতে পারে নি। এ-ব্যাকরণগুলো কোমলমতি ছাত্রদের সাহায্য করেছে পরীক্ষা পাশ করতে, এবং ব্যাকরণে ভয় পেতে।

কিন্তু আরেক দল ব্যাকরণবিদ দেখা দিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ দশকেই, যাঁরা নতুনভাবে বাঙলা ভাষা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বাঙলা ভাষায় গভীর ব্যাপকভাবে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ পরিপূর্ণ ব্যাকরণ বই লেখেন নি। তাঁরা বাঙলা ভাষার নানা দিক সম্পর্কে নতুন আর মূল্যবান আর গভীর আর আন্তরিক আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, এবং আরো কয়েকজন।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-সংগীতরচয়িতাই নন, তিনি একজন অসাধারণ ব্যাকরণবিদও। তরুণ বয়সেই তিনি বাঙলা ভাষা বিশ্লেষণে মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং তার ফলেই রচিত হয়েছিলো তাঁর চমৎকার বই *শব্দতত্ত্ব* (১৯০৯)। এরপরে, শেষ বয়সে, লেখেন তিনি *বাংলাভাষা পরিচয়* নামে (১৯৩৮) আরেকটি চমৎকার বই। আধুনিক কালে সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা চলছে।

ব্যাকরণ কারো কাছে কবিতার মতো মিষ্টি, ছবির মতো সুন্দর মনে হবে না। এমন কাউকেই হয়তো খুঁজে পাবে না পৃথিবীতে যে অবসর সময়ে ব্যাকরণ পড়ে, বা বেড়াতে যাওয়ার পথে গাড়ির দেয়ালে বা আসনে হেলান দিয়ে ব্যাকরণ বই পড়ে। ব্যাকরণ মনোহর বই নয়। কিন্তু ভাষায় উৎসাহ আছে যার, যে-ভাষার নিয়ম জানতে চায় বিজ্ঞানীর মতো, যে জানতে চায় নিজের ভাষার কলকাঠি, ব্যাকরণ তাকে ডেকে নেবে। ঢুকলে দেখা যাবে এখানে আছে নতুন শব্দ তৈরির কতো উপায়, চমৎকার বাক্য বানানোর অজস্র পদ্ধতি। ব্যাকরণ আমাদের শুধু শুদ্ধাশুদ্ধির পড়া শেখায় না, শেখায় ভাষার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সূত্র আবিষ্কারের কৌশল। ব্যাকরণ আমাদের ক'রে তোলে ভাষার বৈজ্ঞানিক : ভাষাবিজ্ঞানী। তাই ব্যাকরণ মূল্যবান।

www.BDeBooks.Com

শব্দ বানাই

আমরা কথা বলি : মুখ থেকে বেরিয়ে আসে গুচ্ছগুচ্ছ ধ্বনি। ধ্বনিগুলো যেনো খাঁচা-থেকে-বেরিয়ে-পড়া পাখির ঝাঁক, একবার মুখপিঞ্জর থেকে ডানা মেলে বেরিয়ে পড়তে পারলে তারা আর কোনোদিন খাঁচায় ফেরে না। মিলিয়ে যায় আকাশে বাতাসে অনন্তে। তবে আমাদের মুখ এক চমৎকার ধ্বনি বানানোর যন্ত্র, যা মুহূর্তে মুহূর্তে বানাতে পারে নানা রকম গুঞ্জনময় ধ্বনি। তাই মুখ থেকে ধ্বনি যতোই বেরিয়ে যাক না কেনো, তা কখনো ফুরোয় না। যে-ধ্বনিটি এইমাত্র বেরিয়ে গেলো মুখ থেকে, সেটি আর মুখে ফিরে আসবে না কোনোদিন, কিন্তু সে-ধ্বনিটিকে পরমুহূর্তেই বানাতে পারে আমাদের মুখ। আমরা কথা বলি : এর অর্থ হচ্ছে মুখ দিয়ে আমরা অবিরাম উচ্চারণ করি গুচ্ছগুচ্ছ ধ্বনি। ধ্বনিগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে দল বেঁধে, এবং অন্যদের জানিয়ে দেয় আমাদের মনের কথা। পৃথিবীতে ভাষা আছে অনেক : বাঙলা ইংরেজি ফরাশি জর্মন রুশ জাপান তামিল তেলুগু হিন্দি উর্দু আরবি, নানা ভাষা আছে পৃথিবীতে। প্রতিটি ভাষায় রয়েছে গুটিকয় ধ্বনি। সংখ্যায় তারা বেশি নয়। কোনো ভাষায়ই কোটিকোটি বা লাখলাখ বা হাজার হাজার ধ্বনি নেই, এমনকি শ-খানেক ধ্বনিও নেই। যে-ভাষায় সবচেয়ে কম ধ্বনি আছে, তাতে আছে বারোটির মতো ধ্বনি; আর যে-ভাষায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধ্বনি আছে, তাতে আছে ষাটটির মতো ধ্বনি। সামান্য কয়েকটি ধ্বনিকে নানাভাবে সাজিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি ভাষা। যদি কোনো ভাষায় থাকতো হাজার হাজার ধ্বনি, তবে অতো ধ্বনিকে ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারতো না কেউ। ফলে ভাষাটিকে ব্যবহার করতো না কেউ। আসলে হাজার হাজার ধ্বনি মানুষ উচ্চারণই করতে পারে না। আমাদের মুখে ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে বেশ কিছু প্রত্যঙ্গ রয়েছে। সে-প্রত্যঙ্গগুলো উচ্চারণ করতে পারে শ-খানেকের মতো ধ্বনি। তাই হাজার হাজার ধ্বনিতে কোনো ভাষার গ'ড়ে ওঠার কোনো উপায়ই নেই।

বাঙলা আমাদের ভাষা। আমরা কোটি কোটি মানুষ দিনরাত বাঙলা বলি। আবেগে নরম হয়ে কোমল কথা বলি, রাগে তেতে উঠে বলি কড়াকড়া কথা। বাসায় বলি শাদা তুচ্ছ কথা, ইস্কুলে, সভাসমিতিতে শুনি উচ্চ উচ্চ কথা। কেউ ছোটোবড়ো পংক্তি সাজিয়ে কবিতা লেখেন, কেউ

জমজমাট পাতা ভরে রচনা করেন হাজার পাতার উপন্যাস। বলার মতো যতো কথা আছে, সবই আমরা বলি বাঙলায়। মাত্র একদিনে যতো কথা বলে বাঙালিরা তা যদি লিখে ফেলা যেতো, তবে তাতে হয়তো ভ'রে উঠতো পৃথিবীর সমস্ত দালানকোঠা। পৃথিবীভরানো এ-সমস্ত কথার মূলে আছে মাত্র কয়েকটি ধ্বনি। আমাদের সমস্ত কথা পৃথিবীর সমস্ত বাঙলা বই তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কেউ বের করতে পারবে না হাজার হাজার ধ্বনি। এমনকি একশো ধ্বনিও পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে সামান্য কয়েকটি ধ্বনি : আটাশটি ব্যঞ্জনধ্বনি, সাতটি স্বরধ্বনি, আর একটি নাসিক্যগুণ খচিত ধ্বনি। এ-ছত্রিশটি ধ্বনি নানাভাবে মিলেমিশে গড়ে উঠেছে আমাদের বিশালব্যাপক বাঙলা ভাষা।

ধ্বনিদের নিজেদের কোনো অর্থ নেই। কয়েকটি বাঙলাধ্বনির উদাহরণ হচ্ছে [অ, আ, ই, উ ও, ক্, চ্, ট্]। এ-ধ্বনিগুলো পৃথকভাবে উচ্চারণ করলেই বোঝা যাবে যে এদের কারো কোনো অর্থ নেই। [অ]-র আবার অর্থ কি? কীইবা অর্থ আছে [আ]-র? এদের কারো কোনো অর্থ নেই। এরা আমাদের কানে ঢুকিয়ে দেয় নিজ নিজ ধ্বনি, কিন্তু মনে সঞ্চার করতে পারে না কোনো অর্থ। আমরা অন্যের কানে চমৎকার ধ্বনিগুঞ্জন বাজানোর জন্যে কথা বলি না। কথা বলি অন্যদের মনে আমাদের মনের কথা সঞ্চার করে দেয়ার জন্যে। আমাদের কথার অর্থ আছে। ভাষার মৌল জিনিশ হচ্ছে ধ্বনি, কিন্তু ওই মৌল জিনিশের নিজের কোনো অর্থ নেই। ধ্বনিরা একাকী অর্থহীন; কিন্তু তারা একে অন্যের সাথে মিলে তৈরি করতে পারে এমন বস্তু, যার অর্থ আছে। ধ্বনিরা একে অন্যের সাথে অর্থময় যে-জিনিশ তৈরি করে, তাকে বলি শব্দ। শব্দের আছে আপন অর্থ। [আ] ধ্বনির কোনো অর্থ নেই, তেমনি কোনো অর্থ নেই [ম্] ধ্বনির। কিন্তু যখন এরা মিলে তৈরি করে [আম] ধ্বনিগুচ্ছটি, তখন এ-ধ্বনিগুচ্ছকে ঘিরে জড়ো হয় অর্থ। {আম} ধ্বনিগুচ্ছটির আছে অর্থ, তাই এটি একটি শব্দ। আম বলতে আমরা বুঝি এক রকম ফল। শব্দের অর্থ থাকে। তবে শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে কিন্তু নেই কোনো স্বর্গীয় স্বাভাবিক সম্পর্ক : শব্দের সাথে অর্থের সম্পর্ক পাতানো বন্ধুত্ব। আম বলতে আমরা একটি ফল বুঝি। এর কারণ হলো আমরা সবাই মেনে নিয়েছি যে আম বললে আমরা অন্য কোনো কিছু বুঝবো না, বুঝবো বিশেষ ধরনের একটি ফল। ধ্বনির আপন কোনো অর্থ নেই। কিন্তু অর্থ আছে ধ্বনিদের মিলনে গড়ে ওঠা শব্দের।

সামান্য কয়েকটি ধ্বনি অসীম শক্তিমান। তারা একে অন্যের সাথে মিলে নানা কৌশলে গড়ে তোলে ভাষার লাখলাখ শব্দ। বাঙলা ভাষায় কতো

www.BDeBooks.Com

শব্দ আছে, তা কেউ জানে না। মনে করা যাক বাঙলা ভাষায় শব্দ আছে এক কোটি। মাত্র ছত্রিশটি ধ্বনি একে অন্যের সাথে নানাভাবে মিলে গ'ড়ে তুলেছে ওই এক কোটি শব্দ। তবে ওই এক কোটি শব্দ বানাতে গিয়েই সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে নি ধ্বনিগুলো। ইচ্ছে করলে ওই ধ্বনিগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে, অন্যভাবে গেঁথে আমরা বানাতে পারি নতুন নতুন শব্দ।

ধ্বনির সাথে ধ্বনি গেঁথে তৈরি করা হয় শব্দ। তবে কোন ধ্বনির সাথে কোন ধ্বনি গাঁথা যাবে, তার রয়েছে অনেক নিয়ম। পৃথিবীর সব ভাষাতেই রয়েছে ধ্বনিগাঁথার আপন নিয়ম। যে-নিয়মে ধ্বনি গাঁথা হয় বাঙলায়, সে-নিয়মে ধ্বনি গাঁথা হয় না ইংরেজিতে, বা জাপানিতে, বা ফরাশিতে। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিদের মধ্যে থাকে পার্থক্য, আর থাকে ধ্বনি গাঁথার নিয়মের পার্থক্য। তাই একটি ভাষা পৃথক হয়ে ওঠে অন্য ভাষা থেকে। যদি সব ভাষাতে থাকতো একই রকম ধ্বনি ও ধ্বনি গাঁথার নিয়ম, তবে পৃথিবীতে থাকতো শুধু একটি ভাষা। বাঙলা ভাষায় রয়েছে ধ্বনি গাঁথার অনেক নিয়ম। সব নিয়ম আমরা সচেতনভাবে জানি না কেউ। কিন্তু অচেতনভাবে জানি সবাই। দুটি ধ্বনি নেয়া যাক; [আ] এবং [ম্]। আগে আ. এবং পরে ম বসিয়ে বানাতে পারি *আম* শব্দটি। এটি একটি বাঙলা শব্দ। যদি আগে [ম্] এবং পরে [আ] বসাই, তবে গড়ে ওঠে *মা* শব্দটি। এটিও বাঙলা শব্দ। [অ] ধ্বনি, এবং [ঙ] ধ্বনি এবং [ক] ধ্বনি মিলিয়ে পাই *অঙ্ক* শব্দটি। এটিও একটি বাঙলা শব্দ। বাঙলা অনেক শব্দেই পাওয়া যায় [ঙ] ধ্বনিটিকে। কিন্তু [ঙ] ধ্বনি দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হয় না বাঙলায়। তাই 'ঙাক' বা 'ঙুকু' বলে কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না বাঙলায়।

শুধু ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়েও কোনো শব্দ হয় না বাঙলায়। তাই আমরা বানাতে পারি না ক্চ্শ্-র মতো শব্দ। এটি কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। দুটি ব্যঞ্জনধ্বনিতে জোড়া দেয়ার জন্যে বাঙলা ভাষায় অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে একটি স্বরধ্বনি। একটি ইংরেজি শব্দ, রিস্ক্, নেয়া যাক। এ-শব্দটি বানাতে লেগেছে [র্, ই্,স্, ক্], ধ্বনি চারটি। চারটি ধ্বনিই আছে বাঙলাতে। তবু রিস্ক্ শব্দটি বাঙলা নয়। কেনো? যেহেতু এটি বাঙলা ভাষাতে নেই, তাই কি এটি বাঙলা শব্দ নয়? না, এটি বাঙলা নয় অন্য কারণে। যে-নিয়মে এ-শব্দে ধ্বনিরা মিলেছে, সে-নিয়ম নেই বাঙলায়। বাঙলা ভাষায় কোনো শব্দের শেষে 'স্ক্' ধ্বনিগুচ্ছ থাকতে পারে না, কিন্তু থাকতে পারে ইংরেজিতে এবং অন্য অনেক ভাষায়। আস্ক্, মাস্ক্, ডিস্ক্, এর মতো শব্দ বাঙলায় নেই, বাঙলা শব্দের শেষে 'স্ক' ধ্বনিগুচ্ছ থাকতে পারে না বলে। বাঙলায় শব্দের শেষে থাকতে পারে না যুক্তব্যঞ্জন। এবার একটি

শব্দ বানানো যাক : *টশর*। এ-শব্দটির অর্থ কেউ জানে না, এ শব্দটি এর আগে কেউ শোনে নি। কেননা, এটিকে আগে বানানোই হয় নি। কিন্তু এটিকে বানানো যেতো যে-কোনো সময়। ট-অ-শ-অ-র ধ্বনি বাঙলা শব্দে বসতে পারে পাশাপাশি। তাই এ-ধ্বনিগুলোকে পরস্পরের সাথে গেঁথে অনায়াসে বানাতে পারি 'টশর' শব্দটি। এ-শব্দটির প্রয়োজন এর আগে কেউ বোধ করে নি, তাই শব্দটি জন্ম পায় নি। আজ দরকার হলো, তাই বানিয়ে নিলাম। এখন প্রশ্ন উঠবে 'টশর' শব্দের অর্থ কী? এর অর্থ কেউ জানে না, আমিও জানি না। ইচ্ছে করলেই আমরা এ শব্দটিকে দিতে পারি একটি অর্থ। 'টশর' শব্দটিকে দেয়া যাক এর অর্থটি : রূপকথার যে-জানোয়ারের কপালে একটি ধারালো শিং আছে, তাকে বলে টশর। একটি নতুন শব্দ বানালাম আমরা।

তবে আমরা প্রতি মুহূর্তে কিন্তু একেবারে অচেনা অজানা শব্দ বানাই না। ধ্বনির সাথে ধ্বনি গেঁথে হাজার হাজার মূল শব্দ অনেক আগেই বানানো হয়েছে বাঙলায়। সে-মূল শব্দগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করি আমরা। কখনো অবিকলভাবে ব্যবহার করি কখনো এক শব্দকে গেঁথে দিই অন্য শব্দের সাথে এবং বানিয়ে তুলি আরেকটি নতুন শব্দ। কোনো শব্দের বাঁয়ে যোগ করি অন্য এক শব্দ, কোনো শব্দের ডানে যোগ করি অন্য এক শব্দ। ফলে পাই নতুন নতুন শব্দ। ছোটো ছোটো শব্দদের গেঁথে গেঁথে বানিয়ে তুলি নতুন বড়ো বড়ো শব্দ। শব্দের সাথে শব্দ গেঁথে নতুন শব্দ বানানোর অনেক নিয়ম আছে বাঙলায় এবং সব ভাষায়। কেউই আমরা সবগুলো নিয়ম সচেতনভাবে জানি না। তবে বেশ জানি অসচেতনভাবে। ভাষা এক মজার ব্যাপার। এর সামান্য অংশ শিখতে হয় সচেতনভাবে আর বড়ো প্রকাণ্ড অংশ আমরা শিখে ফেলি এমনি এমনি। তা যদি না হতো, তবে ভাষা ব্যবহার করতে পারতাম না আমরা। শব্দের সাথে শব্দ গেঁথে নতুন শব্দ বানানোর নিয়মগুলো আমরা অসচেতনভাবে জানি। কেউ জানি একটু বেশি, কেউ একটু কম।

যখন কথা বলি আমরা, তখন শব্দগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করি যাতে একটির সাথে অন্যটির বেশ গভীর বন্ধুত্ব জন্মে। শব্দগুলোকে ছাড়াছাড়া ভাবে উচ্চারণ করে যাই না, বরং তাদের মধ্যে পাতিয়ে দিই নানারকম সম্পর্ক। এ সম্পর্ক পাতানোর সময় অনেক শব্দের চেহারা যায় বদলে। কোন শব্দের চেহারা কেমনভাবে বদলে যাবে, তার নিয়ম-কানুন বেশ জানি আমরা। *আমি* একটি বাঙলা শব্দ, *তুমি* একটি বাঙলা শব্দ, *চিনি* একটি বাঙলা শব্দ। যখন এ শব্দ তিনটিকে একসাথে বসিয়ে কোনো কথা

www.BDeBooks.Com

বলি, তখন আমি বা তুমি-র চেহারা বদলে যেতে পারে। আমি বলতে পারি, আমি তোমাকে চিনি। *আমি তোমাকে চিনি* বলার সময় *তুমি*-র সাথে যোগ করেছি *কে* শব্দটিকে ; আর অমনি *তুমি* বদলে হয়েছে *তোমা*। আমরা কখনো বলি না : * আমি তুমিকে চিনি; কেননা আমরা জানি যে তুমির সাথে কোনো কিছু যোগ করলে *তুমি* বদলে *তোমা* হয়ে যায়। তেমনি বলতে পারি *তুমি আমাকে চেনো*। এখানে দেখছি যে *আমির* সাথে *কে* যোগ করায় *আমি* বদলে হয়ে গেছে *আমা*। আমরা কখনো বলি না তুমি আমিকে চেনো; কেননা *আমির* সাথে কোনো শব্দ যোগ করলে *আমি* হয়ে যায় *আমা*। খুব চমৎকারভাবে বদলে যায় *সে* শব্দটি। যদি বলি *সে* আমাকে চেনে, তখন *সে*-র কোনো বদল ঘটে না। কিন্তু যখন বলি *আমি তাকে চিনি;* তখন বুঝতে পারি যে *সে*-র সাথে *কে* শব্দটি যোগ করার ফলে *সে* বদলে হয়ে গেছে *তা*। আমরা কখনো বলি না : * *আমি সেকে চিনি* বা * *সেরা আমাকে চেনে*, বা * *সেদের অনেক বই আছে*। *সে*-র সাথে কোনো কিছু যোগ করলেই *সে* বদলে হয়ে যায় *তা*। কথা বলার সময় এভাবে বদলে যায় অনেক শব্দের আপন চেহারা। খুব বেশি শব্দের চেহারা এমনভাবে বদলায় না। চেহারা বদলে কিন্তু সৃষ্টি হয় না একেবারে অচেনা অজানা অভিনব শব্দ। বরং শব্দগুলো একটু নতুন চেহারা পায়।

কিন্তু শব্দের সাথে শব্দ মিলিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি বেশ নতুন শব্দ, যাদের অর্থও নতুন। এমন নতুন শব্দ বানানোর হাজারো নিয়ম আছে বাঙলায়। এ নিয়মগুলো তৈরি করে অজস্র নতুন শব্দ। একটি শব্দ নিচ্ছি : *সংবাদ*। এ শব্দটি আমরা প্রতিদিন শুনি, এই অর্থও জানি অনেকে। এটির সাথে যোগ করতে পারি *ইক* রূপের একটি শব্দ। সংবাদ ও ইক যোগ ক'রে বানাতে পারি *সাংবাদিক* শব্দটি। যাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন ও পরিবেশন করেন, তাঁদের বলা হয় সাংবাদিক। যদি *সং* বদলে *সাং* না হতো, তা হলে পেতাম * *সংবাদিক*। কিন্তু *সংবাদিক শব্দটিকে* আমরা গ্রহণ করি না, গ্রহণ করি *সাংবাদিক* শব্দটিকে। *সাংবাদিক* শব্দের সাথে যোগ করতে পারি *তা* শব্দটি; এবং বানাতে পারি *সাংবাদিকতা* শব্দটি। সাংবাদিকের পেশা বা কাজকে বলা হয় সাংবাদিকতা। এভাবে *সাহিত্য* শব্দের সাথে *ইক* যোগ করে বানাতে পারি *সাহিত্যিক* শব্দটি। একই নিয়মে *প্রবন্ধ* শব্দের সাথে *ইক* শব্দ যোগ করে বানাতে পারি *প্রাবন্ধিক* শব্দ। কিন্তু *সাহিত্যিক*, ও *প্রাবন্ধিক* শব্দের সাথে *তা* যোগ করে আর কোনো নতুন শব্দ আমরা বানাই না। তাই বাঙলা ভাষায় * *সাহিত্যিকতা*, বা * প্রাবন্ধিকতা রূপের কোনো শব্দ নেই। সাহিত্যিক-এর পেশাকে আমরা * সাহিত্যিকতা বলি না এবং প্রাবন্ধিক-এর

পেশাকেও বলি না * প্রাবন্ধিকতা । শব্দ বানানোর নিয়মগুলোর শক্তি বেশ কম। প্রতিটি নিয়ম দিয়ে বানাতে পারি সামান্য কয়েকটি শব্দ। যদি কোনো নিয়মকে প্রচুর পরিমাণে খাটাই, তবে এমন সব শব্দ বানিয়ে ফেলবো, যারা একেবারে নতুন ও অর্থহীন।

আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল-এর মতো শব্দ বইতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। *আপাদমস্তক* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত, *আসমুদ্রহিমাচল* শব্দের অর্থ সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত। এ-শব্দগুলো বানানো হয়েছে একটি মজার নিয়ম খাটিয়ে। কোনো জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গা পর্যন্ত এলাকাকে বোঝানোর জন্যে আমরা ব্যবহার করি এ-নিয়মটি। প্রথমে বসাই একটি আ, পরে বসাই শুরু এলাকার শব্দটি; এবং শেষে বসাই শেষ এলাকার শব্দটি। এভাবে বানাই আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু এ-নিয়মটি খাটিয়ে বানানো যায় না বেশি শব্দ। তাই আমরা বানাতে পারি না * আবাড়িইস্কুল (বাড়ি থেকে ইস্কুল পর্যন্ত), আঘরমাঠ (ঘর থেকে মাঠ পর্যন্ত), বা আঅনন্যমৌলি (অনন্য থেকে মৌলি পর্যন্ত)। এসব শব্দ এ-নিয়মের সাহায্যে বানানো যায়, তবে তাদের মেনে নেবে না অনেকে। মাঝে মাঝে কবিরা অভাবিতভাবে শব্দ বানাতে পারেন। স্বপ্ন থেকে শরীর পর্যন্ত এলাকা বোঝানোর জন্যে যদি বানাই *আস্বপ্নশরীর* শব্দটি, তবে এটিকে মেনে নিতে পারে অনেকে।

শব্দ বানানোর রয়েছে অনেক কৌশল। কৌশলগুলো বেশ মজার, চমৎকার খেলার মতো মনে হ'তে পারে। শব্দ যাদের মুগ্ধ করে তারা বানাতে চায় নতুন নতুন শব্দ। অনেকে শব্দকে সাজিয়ে দিতে পারে অনেক রঙে, বিভিন্ন গন্ধে। যারা তা পারে, তারা কেবল প্রতিদিনের কথা বলার জন্যে শব্দ ব্যবহার করে না। তারা কথাকে অমর ক'রে রাখতে চায়। তারা কবি। তারা পৃথিবীকে ভ'রে দেয় শব্দের রূপে ও সৌরভে।

www.BDeBooks.Com

এসো কবিতা পড়ি

কবিতা যেনো একটা খুউব সুন্দর পাখি, যা গাছের ডালের নীল সবুজ পাতার ভেতর লুকিয়ে থেকে মধুর স্বরে ডাক দেয়। যেন কোকিল। কোকিল নামের সেই ছোট্ট, কালো, মিষ্টি পাখিটির ডাকে যেমন সবাই আমরা মুগ্ধ হই, তেমনি মুগ্ধ হই কবিতা পড়ে। শিশুকালে হারিকেনের আলোতে, বা ভোরের বাতাসে দুলে দুলে মাথা নাচিয়ে কবিতা পড়তে শিখি। আমরা যারা কবিতা পড়েছি, সবাই বুঝেছি, কবিতা যাদু জানে। যদি কবিতা একবার ভালো লাগে, তবে আর কথা নেই, বারবার তা পড়তে হয়। ব্যাগ দুলিয়ে ক্লাশে যাবার পথে, একাএকা, বা আকাশে লাল ঘুড়ি ওড়াবার সময় না জেনেই তা আবৃত্তি ক'রে ফেলি। কিছু কবিতার পংক্তি বলি :

১ বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

২ আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে

৩ পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

৪ আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে

৫ ভোর হল দোর খোল খুকুমণি ওঠরে
ওই ডাকে জুঁই শাখে ফুল-খুকি ছোটরে

৬ আমি যদি হই ফুল হই ঝুঁটি বুলবুল হাঁস।

তোমরা অনেকেই হয়তো ওপরের সবগুলো কবিতা মুখস্থ ক'রে ফেলেছো। তার কারণ, এরা এতো সহজে ভালো লেগে যায় যে ভুলতে দেয় না। ছোটোবেলায় যখন কবিতা পড়ি, তখন কবিতার অর্থটা কিন্তু বড়ো হয়ে দেখা দেয় না। দেখা দেয় আরেকটা জিনিশ, যার নাম ছন্দ। ছন্দ এক মোহনীয় যাদুকর, কবিতার ভেতরে সে এমন দোলা, স্বর সঞ্চার করে দেয় যে তাকে বারবার আবৃত্তি না করে পারা যায় না। বাল্যকালে যে সব কবিতা ভালো লাগে, তাদের অধিকাংশই কিন্তু ছড়া, বেশ ছোট্ট ছোট্ট। ছড়ার কিন্তু সব সময়ই কোনো অর্থ থাকে না। আবার কোনো পংক্তির অর্থ যদি মাথা ঘামিয়ে পাওয়া গেলো, তবে আবার মুশকিল হয় পরের পংক্তি নিয়ে। তাই আমরা ছড়ার অর্থ একটুও খুঁজি না, কেননা বুঝি না। যাকে বুঝি তাকেই খুঁজি। খুঁজে পাই মনমাতানো ছন্দ, তাল এবং শুনতে মজা লাগে এমন একরাশ কথা। তাদের বেশ ভালো লাগে, দুর্বোধ্য, মনোরম বন্ধুর মতো। ধরা যাক :

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তাদের খাড়া দুটি শিং.

এরা কারা, কী তাদের নাম? যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, তবে আমি সোনালি ধানক্ষেতের পাশে সবুজ নীল মাঠের দিকে তাকিয়ে, শার্টের পকেট থেকে কুল বের করে খেতে খেতে, খুব মাথা দুলিয়ে বলবো, জানি না, জানি না, তাদের জানতে চাই না। জানি তারা অদ্ভুত, সুন্দর, কেননা এই ছড়ার যে ধ্বনি, তা সুন্দর!

ছড়ার সাধারণত কান-ভোলানো মন-দোলানো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা থাকে। আর থাকে নাচ, অর্থাৎ ছন্দ। ছড়াকার আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ পান, আবার কখনো দেখেন হয়তো একটা বিরাট জুতো, যার মধ্যে অনায়াসে চেয়ার, টেবিলসহ বাস করা যায়।

ছন্দ জিনিশটা কী, তাও বোঝা দরকার। যারা অল্পস্বল্প বুঝি, তাদের মতে, এটি হচ্ছে কবিতায় যে-কথাগুলো বলা হচ্ছে, সেগুলো এমনভাবে বলা হয়, যেনো তাদের মধ্যে তাল জেগে ওঠে। যেমন :

ভোর হলো দোর খোল খুকুমণি ওঠরে,
ওই ডাকে যুঁইশাখে ফুলখুকি ছোটরে

এই পংক্তি দুটিকে আমরা পড়ি এভাবে :

ভোর হলো / দোর খোল / খুকুমণি / ওঠরে /
ওই ডাকে / যুঁই শাখে / ফুলখুকি / ছোটরে /

মধ্যে মধ্যে যে দাগগুলো দিয়েছি, সেখানে আমরা কিছু সময়ের জন্যে থেমে পড়ি, আবার শুরু করি এবং দেখি, 'ভোর হলো' পড়তে যে সময় লেগেছে, 'দোর খোল' পড়তে লেগেছে ঠিক ততোখানি সময়। এবং সারাটা কবিতা এভাবে পড়াতে জেগে ওঠে ঘুমিয়ে-থাকা সে-যাদুকর, নাম যার ছন্দ। যদি পড়তাম;

ভোর হলো দোর / খোল/ খুকুমণি / ওঠরে /।
ওই ডাকে / যুঁই শাখে ফুল / খুকি ছোটরে /।

তবে ঘুমের দেশে কোনোদিন ঘুম ভাঙত না, সারা কবিতাটি কুইনাইনের মতো, নিমের মতো তেতো হয়ে উঠত। ছেলেবেলায় মিল জিনিসটি লজেঞ্চুশের মতোই লোভনীয়, মিষ্টি লাগে। মিল ছাড়া যে-কবিতা, তা তো মাটির মারবেল। তাই মিল চাই। মিল কী? আমরা দেখি, সাধারণত কবিতার এক পংক্তির শেষ শব্দটির সঙ্গে পরবর্তী পংক্তির শেষ শব্দটির মধ্যে মিল থাকে। যেমন : ধেনু, বেণু, তিল, ঝিল, নীল, কাঁচা, বাঁচা :

www.BDeBooks.Com

পঁ্যাচা কয় পঁ্যাচানি
খাসা তোর চঁ্যাচানি

এখানে পঁ্যাচানির সঙ্গে মিল আছে চঁ্যাচানির। যদি পরের পংক্তির শেষ শব্দটি হতো জামাটি তবে মিল থাকতো না; তখন ছড়াটি কেমন লাগতো? ছেলেবেলায় মিল চাই, বড়ো হ'লে বেশি চাই না।

কবিতা যে কতো রকমের আছে তা ব'লে শেষ করা যায় না। তবে সব কবিতার কাজ হলো মনকে আনন্দ দেয়া। যে কবিতা তা দেয় না, তাকে কবিতা বলতে ইচ্ছে হয় না, আমরা বলি ওগুলো পদ্য। 'পদ্য' অর্থাৎ সেখানে ছন্দ মিল সব কিছুই নিয়ম মতো আছে, নেই শুধু আনন্দ দেয়ার মধুর ক্ষমতা। যুগ যুগ ধ'রে, হাজার হাজার বছর ধ'রে কবিতা লেখা হচ্ছে। তার ফলে কবিতার রকমের শেষ নেই। কোনো কবি কবিতায় (বা, পদ্যে) গল্প বলেছেন, কেউ নীতিকথা শিখিয়েছেন, কেউ যুদ্ধবিগ্রহের মহামহা কাব্য লিখেছেন, আবার কেউ 'সমাজ সংসার মিছে সব' বলে নিজের মনের কথা বলে গেছেন। যাঁরা কবিতায় গল্প বলেছেন, তাঁদের আসল লোভটা কিন্তু গল্পের দিকেই। গল্পকে তাঁরা ছন্দের পাখা পরিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে সেই গল্পগুলো টেকসই হয়েছে একটু বেশি, কেননা তার মধ্যে ছন্দ এবং মিল রয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে এরকম অনেক কাব্য আছে। যেমন ধরো কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গলকাব্য* বা বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গলকাব্য।* আবার কেউ কেউ নীতিকথা বেশি প্রচারের জন্যে কবিতার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও কিন্তু এরকম নীতিমূলক ছোটো ছোটো পদ্য লিখেছেন। যেমন :

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলি ডাক যদি, দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন শিখা বলে, এসো মোর দাদা।

রবীন্দ্রনাথের এটি নীতিকথামূলক হলেও, কী এক কারণে যেনো এটাকে বেশ লাগে; কিন্তু নীতিকথার বাড়াবাড়ি হয়ে যায় বলে অনেকের নীতিকথাভরা পদ্য একেবারেই পড়া যায় না। যুদ্ধবিগ্রহ এবং জীবন নিয়ে লম্বা কাব্য পৃথিবীর সব দেশেই লেখা হয়েছে। এগুলো সাধারণত পুরানো দিনেই লেখা হতো। এগুলোকে বলে মহাকাব্য। গ্রিসদেশে মহাকাব্য লিখে অমর মহাকবি হয়েছেন হোমার। তাঁর বইয়ের নাম *ইলিয়াড, অডেসি*। ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন মিল্টন, তাঁর কাব্যের নাম *প্যারাডাইস লস্ট।*

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাসদেব লিখেছেন *মহাভারত* এবং বাল্মিকী লিখেছেন *রামায়ণ*। বাঙলা ভাষায় লিখেছেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর মহাকালজয়ী কাব্যটির নাম *মেঘনাদবধকাব্য*। তাঁকে অনুসরণ ক'রে বাঙলাভাষায় অনেকেই–হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *(বৃত্রসংহার)*, নবীনচন্দ্র সেন *(কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস)*, কায়কোবাদ *(মহাশ্মশান)* মহাকাব্য লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি বাঙলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো, প্রিয় এবং বিশ্বের একজন বড়ো কবি, মহাকাব্য লেখেন নি। তিনি নিজের মনের কথা বলতেই ভালোবাসতেন। নজরুল ইসলাম শোনান আরেক রকম কথা। তিনি কবিতায় যারা দরিদ্র, অন্নহীন, তাদের দাবি জানান।

তোমরা আজ কি কবিতা পড়ো? ইস্কুলের তিনটে পদ্য পড়েই কি গুটিয়ে গুটিয়ে রেখে দাও কবিতার বই টেবিলের কোণে? নাকি ইচ্ছে হয় আরো পড়তে, ঝংকার দিয়ে কি তোমাদের ডাক দেয় না কবিতা? সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি কবিতার পংক্তি বলছি :

১ সিন্ধুর টীপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ।

২ রূপশালি ধান বুঝি এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ি তার হাসি মিষ্টি।

তোমরা নিশ্চয় মুগ্ধ হও এই ধ্বনিতে, আর সারাটা বাল্যকাল লাফিয়ে ওঠে। বাল্যকালটা ছড়ার কাল, ধ্বনিময় কবিতা পড়ার কাল। এ-সময়টা উদ্ভট, অসম্ভব কবিতার ছবি পড়ার কাল।

এসো, যখন ভূগোল পড়া শেষ হয়ে গেছে, ইতিহাস বাকি নেই, অঙ্কের ঝামেলাটা পেরোনো গেছে, তখন কবিতার বই খুলে ধরি। ছন্দের স্বরে আর কথার সুরে ভেসে যাই এক স্বপ্নভরপুর সব পেয়েছির দেশে। সে-মিষ্টি মুহূর্তে সব কিছুকে কবিতা মনে হোক : আকাশ একটি কবিতা, চিল একটি কবিতা, হাঁস একটি কবিতা, হারানো মারবেলটি একটি সুন্দর, চিরকাল-মনে-রাখা মিষ্টি কবিতা।

www.BDeBooks.Com

ওর নাম মেয়ে

ওর নাম মেয়ে। ওকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে চাই না। ওর কোনো উপমা নেই। ওকে গোলাপ বলতে চাই না; গোলাপ সুন্দর, খুব সুগন্ধ গোলাপের। কিন্তু গোলাপ মেয়ে নয়, গোলাপ মানুষ নয়। ওকে চাঁদ বলবো না। চাঁদ সুন্দর, চাঁদের খুব জ্যোৎস্না; কিন্তু চাঁদ মেয়ে নয়, চাঁদ মানুষ নয়। ওকে মিছে ক'রে আলো বলবো না। আলোতে অন্ধকার কেটে যায়। কিন্তু আলো মেয়ে নয়, আলো মানুষ নয়। ও মানুষ, ও মেয়ে। ওর নাম মেয়ে। ও মেয়ে, ও পৃথিবীর অর্ধেক। চাঁদ ছাড়া চলে, গোলাপ ছাড়া চলে। ওকে ছাড়া চলে না।

ও এখন ছোটো। ও বেড়ে উঠছে বাঙলাদেশের গ্রামে, শহরে। ওর নাম পানু, রাজিয়া, স্মিতা, সায়মা, হাজেরা, রহিমা, মালতি, দুর্গা। ও বেড়ে উঠছে ভারতের গ্রামে, শহরে। ওর নাম মীনাক্ষী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সীতা, নাজমা। ও বেড়ে উঠছে ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এশিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায়। ওর নাম নাতাশা, মেরি, জুনকো, লাইলিং, মাৎসোমাতো, ল্যয়লা। পৃথিবী ভরে আছে ও; কোটি কোটি নাম ওর। ওর আসল নাম মানুষ। ওর দ্বিতীয় আসল নাম মেয়ে।

ও এখন ছোটো, ছোটো ছোটো পা ফেলে সামনের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু ওকে এগোতে দিতে চায় না অনেক সমাজ। ও যখন একটু বড়ো হবে এক সমাজ বলবে, আর এগিয়ো না। বলবে, তুমি মাথা ঢাকো, মুখ ঢাকো। আরেক সমাজ বলবে, তুমি একটা মোটা পর্দা দিয়ে নিজেকে ঢেকে দাও। যেনো তোমাকে কেউ দেখতে না পায়। ও বই পড়তে চায়। আরেক সমাজ খুব কালো আঙুল তুলে ওকে বলবে, সাবধান, তুমি বই পড়বে না। তোমার পড়াশুনোর কোনো দরকার নেই। পড়লে পাপ হবে তোমার। কোনো সমাজ বলবে, তুমি ঘরে থাকো। তুমি কারো দিকে তাকাবে না। সাবধান, অন্ধও যেনো তোমাকে না দেখে।

ওর অনেক শত্রু। কোনো সমাজ ওর চোখ অন্ধ ক'রে দিতে চায়। কোনো সমাজ ওর পা খোঁড়া ক'রে দিতে চায়। কোনো সমাজ ওর কান বধির ক'রে দিতে চায়। আরবে অনেক আগে মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া হতো। একটি মেয়ে যেই জন্ম নিতো, সারা বাড়িতে শোকের ছায়া নামতো।

এখনো আমাদের দেশে অনেক বাড়িতে মেয়ে জন্ম নিলে সবাই দুঃখ পায়। চীনে এক সময় মেয়েদের শিশু বয়স থেকেই পরিয়ে রাখা হতো কাঠের জুতো। ওই ছোটো কাঠের জুতোর ভেতরে বাড়তে পারতো না তাদের পা। তারা হাঁটতে পারতো না। কোনো কোনো দেশে ছেলেরা বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতো, বিধাতা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে মেয়ে করো নি ব'লে। মেয়ে হওয়ার থেকে পশু হওয়াও ভালো। আর মেয়েরা বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতো, বিধাতা তোমাকে ধন্যবাদ; আমাকে তুমি যা করেছো তার জন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ।

ওকে বন্দী ক'রে রাখতে পছন্দ করে সব সমাজ। ওকে বন্দী করার জন্যে পুরোনো কাল থেকেই লেখা হয়েছে অনেক বই। অনেক শ্লোক লেখা হয়েছে ওকে আটকে রাখার জন্যে। ওকে পীড়ন করার জন্যে বানানো হয়েছে অনেক নিয়ম। তাই পুরোটা সভ্যতা, যদি তাকে সভ্যতা বলা যায়, ওর মাথার ওপর এক বড়ো পাহাড়ের মতো চেপে আছে। ও মেয়ে, ও মানুষের অর্ধেক; কিন্তু মানুষের অন্য অর্ধেক ওকে পীড়ন করেছে। ওর কোনো প্রতিভাকেই স্বীকার করে নি। ওকে বেড়ে উঠতে দেয় নি মানুষের মতো।

ওকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছে অনেক সমাজ। ওর বাইরে যাওয়া নিষেধ। ওকে অর্ধেক মানুষ ব'লে ঘোষণা করেছে অনেক সমাজ। অনেক পুরোহিত রটিয়েছে যে মেয়েদের আত্মা নেই। আসলে আত্মা ব'লেই কিছু নেই। অনেকে বলেছে ও হচ্ছে নরকের দরোজা, ওকে দোষী করেছে সব দোষে। এ সবই মিথ্যে কথা। ওর বিরুদ্ধে যতো কথা লেখা আছে, তার সবই মিথ্যে। অনেক সমাজ ওকে মানুষ ব'লেই মেনে নেয় নি। সব ভাষায়ই মানুষ বললে বোঝায় ছেলেদের, মেয়েদের বোঝায় না। কোনো ধর্মেই ওর সম্পর্কে ভালো কথা নেই। সব ধর্মই ওর শত্রু।

ওকে যে এতো পীড়ন করা হয়েছে, তার কারণ ও মেয়ে; ও শারীরিকভাবে দুর্বল। শরীরই ওর নিয়তি। ছেলেদের থেকে কিছুই কম নেই ওর, বরং বেশিই রয়েছে অনেক কিছু। শুধু ওর শারীরিক শক্তি কম। এজন্যে ওকে ভয় দেখায় সারা সমাজ। এজন্যে ওর ওপর অত্যাচার চলছে কয়েক হাজার বছর ধ'রে। একটি ছেলে ভয় পায় না একা বেরোতে; দিনে ভয় পায় না রাতেও ভয় পায় না। কিন্তু ওর জন্যে দিনরাত ভয় বাঘের মত দাঁড়িয়ে আছে মানুষের জঙ্গলে। যে-দেশ যতো অসভ্য সে-দেশে ওর ভয় ততো বেশি। বিলেতেও মাঝরাতে ও একা বেরোয়, আর আমাদের দেশে দিনের বেলাও ওর বেরোতে ভয় লাগে।

www.BDeBooks.Com

ও অনেক কাজ করে, তবে ওর কাজের মূল্য নেই। ও যখন বড়ো হয় বাসায় অনেক কাজ করে ও, কিন্তু ওর কাজ কোনো মূল্য পায় না। ও রান্না করে, ওর রান্না খেয়ে সবাই বাঁচে; কিন্তু রান্নার কোনো মূল্য নেই। ওর রান্না অন্যরা খাবে বেশি করে, ও নিজেই খাবে কম। ও যদি লেখাপড়া শেখে, তাহলে চাকুরি পেতে কষ্ট হবে, পেলেও বেতন কম পাবে; আর সহজে উন্নতি হবে না। রাজনীতি বলে একটা বড়ো ব্যাপার রয়েছে। সেখানে ওর ভূমিকা নেই বললেই চলে। কয়েক দশক আগেও ওর ভোট দেয়ারই অধিকার ছিলো না। এখনো অনেক আরব দেশে ও ভোট দিতে পারে না। যেহেতু ও মেয়ে। একটা অন্ধও ভোট দিতে পারে, ও পারে না; ওর অধিকার নেই ভোট দেয়ার। অন্ধের থেকে, বিকলাঙ্গের থেকেও ওর অধিকার কম।

ওর যে উচ্চাভিলাষ থাকতে পারে, তা মনে পড়ে না কারো। ওর ইচ্ছে হ'তে পারে রাষ্ট্রপতি হওয়ার। কিন্তু সমাজ এটা ভাবতেই পারে না। বাঙলায় রাষ্ট্রপতি শব্দটিই এমন যে রাষ্ট্র ধ'রেই নিয়েছে ও মেয়ে, ও কোনো দিন 'পতি' অর্থাৎ 'স্বামী' হতে পারবে না রাষ্ট্রের। ওর ইচ্ছে করতে পারে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বিমানচালক, বিচারপতি, সেনাপতি, ও আরো অনেক কিছু হওয়ার। এখন কেউ কেউ প্রকৌশলী, চিকিৎসক, এমনকি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে; কিন্তু বিচারপতি, সেনাপতি হওয়ার কথা ভাবতে পারে না অনেক সমাজ। আর কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক? কোনো কোনো সমাজে হচ্ছে, তবে অধিকাংশ সমাজ ওকে পরিচারিকাই ক'রে রাখতে চায়।

ওর অপব্যবহার করতে চায় সব সমাজ। ওকে ক'রে তুলতে চায় শুধু অভিনেত্রী, ক'রে তুলতে চায় শুধু নর্তকী। বিক্রি করতে চায় শুধু ওর সৌন্দর্য। খুব বিপরীত ব্যাপার ঘটে সমাজে সমাজে। কোনো সমাজ ওর সৌন্দর্য মোটা পর্দায় ঢেকে রাখতে চায়। কোনো সমাজ পথে পথে বিক্রি করতে চায় ওর সৌন্দর্য। কোনো সমাজ ওকে মনে করে আগুন, যাকে ঢেকে রাখা দরকার। কোনো সমাজ ওকে মনে করে পণ্য, যাকে তারা বিক্রি করে বাজারে বাজারে।

ওকে স্বাধীনতা দিতে চায় না কেউ। ও যে মানুষ, তাও স্বীকার করতে চায় না অনেকে। পৃথিবীতে চিরকাল ধরে চলছে শোষণ। শক্তিমান শোষণ করে দুর্বলকে, ধনী শোষণ করে গরিবকে, আর সবাই শোষণ করে ওকে। ও মেয়ে, পৃথিবীতে ও সবচেয়ে শোষিত। কারাগারগুলোতে অনেক বন্দী রয়েছে; কিন্তু ও বাইরে থেকেও সবচেয়ে বেশি বন্দী। পৃথিবীতে বহু মানুষ

এখনো স্বাধীনতাহীন; তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতাহীন ও, কারণ ও মেয়ে। এখন ওরই সবচেয়ে বেশি দরকার স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না। নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় নিজেকেই। এখন পৃথিবী জুড়ে জেগে উঠছে ও, আর যে একবার স্বাধীনতা চায় তাকে কেউ অধীন ক'রে রাখতে পারে না। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাই অর্ধেক স্বাধীনতা। ওও শিগগিরই হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ও মেয়ে, ওর কোটি কোটি নাম। ওর আসল নাম মানুষ। ওর দ্বিতীয় আসল নাম মেয়ে। ও গোলাপ নয়, ও চাঁদ নয়, ও আলো নয়, ও সন্ধ্যার মেঘমালা নয়। ও মানুষ, ও মেয়ে। ও পৃথিবীর অর্ধেক, সভ্যতার অর্ধেক। সভ্যতার অর্ধেক ওর সৃষ্টি; ভবিষ্যৎ সভ্যতার বড়ো অংশ সৃষ্টি হবে ওর প্রতিভায়। এতোদিন বোকা মানুষ কাজে লাগিয়েছে তার অর্ধেক প্রতিভা, ছেলেদের প্রতিভা। ভবিষ্যতে মেয়ে আর ছেলের মিলিত প্রতিভায় বিকশিত হবে মানুষ ও তার পৃথিবী। সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে অনন্ত মহাজগত।

www.BDeBooks.Com

উটের গ্রীবার মতো

আমরা বাস করি বাস্তব পৃথিবীতে। একটি মেয়ে ছবি আঁকছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, মৌলি স্বপ্ন দেখেছে; এ-ব্যাপারগুলো বাস্তব। অনেক মেয়েই ছবি আঁকতে পারে এবং আঁকে। সূর্য অস্ত যায় প্রতিদিন। সবাই আমরা স্বপ্ন দেখি, মৌলিও স্বপ্ন দেখে। এ-ঘটনাগুলোতে অবাস্তবতা কিছু নেই; অলৌকিকতা নেই কোনো। কিন্তু যদি বলি, একটি ছবি একটি মেয়েকে আঁকছে, তবে শিউরে উঠবে অনেকে। ছবি তো মেয়ে আঁকতে পারে না, যদিও কোনোকোনো মেয়ে ছবি আঁকতে পারে। সূর্য অস্ত যায় প্রতিদিন, এবং সারা পৃথিবী ভরে নেমে আসে সিল্‌কের মতো অন্ধকার। তাই সূর্য অস্ত যাচ্ছে কথায় চমকে উঠবে না কেউ।

কিন্তু যদি বলি, উপমা অস্ত যাচ্ছে, তবে চমকে উঠবে অনেকে। উপমা একটি মেয়ের নাম, সে তো অস্ত যেতে পারে না। পৃথিবীতে অস্ত যেতে পারে শুধু চাঁদ ও সূর্য। আর কেউ বা কিছু অস্ত যেতে পারে না, বা অস্তমিত হতে পারে না। তাই উপমার অস্ত যাওয়া এক অবাস্তব অলৌকিক ব্যাপার।

মৌলি স্বপ্ন দেখেছে বললে অবাক হয় না কেউ; বরং জানতে চায় স্বপ্নে সে কী দেখেছে। কিন্তু যদি বলি আমাদের চায়ের কাপটি গতরাতে একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছে, তবে কেউ হাসবে, কেউ চমকাবে, কেউ শিউরে উঠবে। চায়ের কাপ কি স্বপ্ন দেখতে পারে! চায়ের কাপ তো স্বপ্ন দেখতে পারে না।

আমরা বাস্তবে বাস করি, এবং বাস্তব কথা বলি। কিন্তু সব সময় কি বাস্তব কথা বললে চলে? না, চলে না। অনেক সময় চারপাশের বাস্তব জগৎকে পেরিয়ে আমরা চলে যাই অন্য জগতে, এবং বলি সেই অন্য জগতের বাস্তব কথা। রূপকথা শুনেছি আমরা সবাই। রূপকথায় ঘটে নানা অলৌকিক ঘটনা। বাস্তবে তেমন ঘটনা ঘটে না কখনো। সে-ঘটনাগুলো আমাদের জগতে অবাস্তব, তবে রূপকথার জগতে বাস্তব। যদি বলি, আমাদের চায়ের কাপটির লাল ঠোঁট আছে, তাহলে হো হো করে হাসবে কেউ কেউ, কেউ অবাক হবে ভীষণভাবে; আর কেউ কেউ চায়ের কাপের লাল ঠোঁটের কথা ভাবতে ভাবতে অন্য বাস্তব জগতে চ'লে যাবে।

যারা খুব বাস্তব মানুষ, তারা কখনো অন্য বাস্তব জগতে যায় না। তারা বলে শুধু বাস্তব বাস্তব কথা। কিন্তু যারা কল্পনাপ্রবণ, স্বপ্ন দেখতে যারা

ভালোবাসে, তারা এমন কথা বলতে পারে, যা আমাদের নিয়ে যায় স্বপ্নের অবাস্তব বাস্তব পৃথিবীতে। দিনরাত কথা বলি আমরা। পৃথিবীতে যা ঘটে, যা ঘটতে পারে, যা সত্য পৃথিবীতে, তেমন কথাই কি শুধু বলি আমরা? আমাদের কি সব সময় বলা উচিত সম্ভবপর কথা? যা ঘটে না, কখনো ঘটে নি, যা সত্য নয়, তেমন কথা কি বলতে পারি না? বলা কি উচিত নয়?

কবিদের কবিতায় অসম্ভবই দখল করে থাকে বড়ো জায়গা; তাঁরা পেরিয়ে যান প্রতিদিনের বাস্তবতাকে এবং আমাদের মনের সামনে হাজির করেন কল্পজগতের সত্য। তাই বাস্তবতাকে কথা দিয়ে তছনছ খান খান ক'রে দিতে পারি আমরা।

আমরা সবাই ভাষা ব্যবহার করি। ইস্কুলে, ব্যাকরণ বইতে আমাদের শেখানো হয় যে এমন কোনো কথা বলা চলবে না, যা অসম্ভব। ব্যাকরণ বইয়ের মতে তুমি আমি বলতে পারি যে পাখিটি উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারি না যে আমি উড়ে যাচ্ছি। কেনো পারবো না? ভাষার সাহায্যে আমরা সম্ভব অসম্ভব সব কথাই বলতে পারি, ও বলবো। বাস্তবে কথা হচ্ছে সঙ্গত কথা, আর যে-কথা বাস্তবতাকে চুরমার ক'রে দেয় তাকে বলি বিসঙ্গত কথা।

বাস্তব কথায় থাকে সঙ্গতি, আর বাস্তব না-মানা-কথায় থাকে বিসঙ্গতি। যে-কথা স্বাভাবিক নয়, তাই বিসঙ্গত। বিসঙ্গত কথা বলা কিন্তু খুব সহজ নয়। সঙ্গত কথা বলাই বেশ সহজ। বিসঙ্গত কথা বলতে হলে আমাদের খুঁজে নিতে হয় এমন ব্যাপার, যা কখনো ঘটে না, বা ঘটে নি। যে-সমস্ত ঘটনার মধ্যে মিল নেই, তাদের মধ্যে মিল বের করলেই বলতে পারি বিসঙ্গত কথা। যদি বলি, মৌলি হাত দিয়ে লাথি মারে, আর পা দিয়ে মারে ভীষণ থাপ্পড়, তাহলে হেসে উঠবে অনেকে। কেননা ব্যাপার দুটি বেশ বিসঙ্গত। হাত দিয়ে কেউ লাথি মারে না, পা দিয়ে কেউ থাপ্পড় দেয় না। পা দিয়ে বিশেষ কায়দায় আঘাত করাকে আমরা বলি লাথি, আর হাত দিয়ে এক বিশেষ কৌশলে ঘা দেয়াকে বলি থাপ্পড়। পায়ের আঘাত হচ্ছে লাথি, আর হাতের ঘা হচ্ছে থাপ্পড়। কিন্তু যখন হাতের ঘাকে লাথি বলি, আর পায়ের আঘাতকে বলি থাপ্পড়, তখন অনেক দিনের সঙ্গতিকে ভেঙে দিই আমরা। ফলে জন্মে বিসঙ্গতি। নানাভাবে বিসঙ্গতি তৈরি করতে পারি আমরা।

বাতাসের কি কোনো রঙ আছে? নেই। যদি বলি, বয়ে যাচ্ছে সবুজ বাতাস, তখন জন্মে কেমন কেমন অনুভূতি। বাতাস কি সবুজ হয়? হয় না। বাতাসের কোনো রঙ নেই। কিন্তু সবুজ বাতাস বললে হাসি আসে না, বরং

www.BDeBooks.Com

মনের ওপর দিয়ে বয়ে যায় বাতাস। যখন দুলতে থাকে ধান চারাগুলো, আর আমাদের মনে হ'তে পারে বাতাস যেনো সবুজ হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্নভরা বিসঙ্গতি তৈরির এক উপায় হলো বিশেষণের অভাবিত ব্যবহার। সুখ, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদির রঙ নেই। কিন্তু এদের আগে যদি বসিয়ে দিই বিভিন্ন রঙ, তখন রঙের ঝলক লাগে মনে। যদি বলি নীল বেদনা, সবুজ শান্তি, লাল আনন্দ, তখন বাস্তব সত্য ভেঙে মনে জন্মে অবাস্তব সত্য। কবিরা এমনভাবে বিশেষণের অভাবিত ব্যবহার করেন প্রচুর, এবং আমাদের মনে জন্মে স্বপ্নভরা অনুভূতি। সময় সম্বন্ধে আমাদের বেশ ধারণা আছে। আমরা জানি গতকালে আর ফিরে যাওয়া যায় না, এবং আগামীকাল এখনো আসে নি। সময় সম্বন্ধে এমন ধারণা নষ্ট ক'রে দিতে পারি আমরা। যদি বলি, আগামীকাল আমি তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম, বা গতকাল আমি তোমাকে দেখতে যাবো, তবে শিউরে ওঠার কথা। আগামীকাল তো এখনো আসে নি, তাই তার অতীত হয়ে যাওয়ার কথাই ওঠে না। গতকাল তো পেরিয়ে গেছে, গতকালে কী ক'রে কাউকে দেখতে যাওয়া যায় ভবিষ্যতে! আমরা কাউকে একদিন, দুদিন, বা কয়েক মাস আগে দেখে থাকতে পারি। তোমাকে আমি একমাস আগে দেখেছি। কাউকে আমরা দেখে থাকতে পারি বিশেষ একটা সময় আগে। কিন্তু যদি বলি, তোমাকে আমি এক আনন্দ আগে দেখেছি, তখন কেমন যেনো মনে হয় কথাটি। আমরা কি সময় আনন্দ বা শোক দিয়ে মেপে থাকি? সময় তো আমরা মাপি সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন দিয়ে।

আমরা যেতে পারি কোনো একটি বিশেষ জায়গা থেকে অন্য একটি বিশেষ জায়গায়। যেমন বলতে পারি, আমি ঢাকা থেকে রাড়িখাল যাবো। বা বলতে পারি, আমি ঢাকা থেকে রাড়িখাল পর্যন্ত হেঁটেছিলাম। ঠিক তেমনি বলতে পারি, আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটেছিলাম। কিন্তু যদি বলি, আমি ঢাকা থেকে দুঃখ পর্যন্ত হেঁটেছিলাম, তবেই কেমন কেমন লাগে কথাটি।

একগুচ্ছ বিসঙ্গত কথা বলছি : আমার পেনসিলটি প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে। পরমাণুদের লাল ঠোঁট আছে। আমার ঘড়িটি দিনে সাতটি সিগ্রেট খায়। স্বপ্ন হচ্ছে এক রকম সাবমেরিন। গোলাপ ফুলেরা ট্রাউজার পরতে ভালোবাসে। আমাদের গাধাটি অঙ্কে খুব ভালো। মৌলির জামাটি কবিতা নাচে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলো প্রত্যেক ভোরে মাখন মেখে টোস্ট পান করে। উপমার কলমটি এক চমৎকার নর্তকী। শহীদ মিনার শ্লোগান দেয়। আমি প্রতি সন্ধ্যায় এক গ্লাস কবিতা খাই।

ওপরের ব্যাপারগুলো বাস্তবে সত্য নয়। পেনসিল স্বপ্ন দেখতে পারে না। আমরা মনে করি শুধু মানুষই স্বপ্ন দেখতে পারে, কেননা মানুষের আছে স্বপ্ন দেখার প্রতিভা। কাঠপেনসিলের কি সে-শক্তি আছে? নেই।
পরমাণুদের আবার ঠোঁট কি? তাও আবার লাল। তারা কি লাল রঙ মাখে ঠোঁটে?

এ-কথাগুলোতে ভাষার কোনো ভুল নেই। তবে কথাগুলো বাস্তবে ঠিক খাটে না। কিন্তু আমরা তো সবসময় বাস্তব মেনে চলতে পারি না। বাস্তব হচ্ছে ছোটো, অবাস্তব হচ্ছে অনেক বড়ো। যদি আজ আমরা আলো হয়ে ছুটে যেতে পারি এমন কোনো গ্রহে, যেখানে ওপরের সব কথাই সত্য, তবে তো এ-কথাগুলো হবে সে গ্রহের বাস্তব কথা।

বাস্তবের ধারণাও কিন্তু সবার একরকম নয়। তুমি যে কলমটি দিয়ে প্রতিদিন লেখো, তার কোনো প্রাণ নেই। কলমটি খায় না, ঘুমোয় না, নিশ্বাস নেয় না। কিন্তু তোমার কাছে কখনো কখনো মনে হতে পারে যে কলমটির প্রাণ আছে। সেটি কথা বলে, চমৎকার ভাষায় ডাকে। যে ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাও, সেটির সাথে গড়ে উঠতে পারে তোমার বন্ধুত্ব, এবং মনে হতে পারে যে ওটি তোমাকে ভালোবাসে। তখন যদি তুমি বলো যে ব্যাগটি আমাকে ভালোবাসে, তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ভাষার সাহায্যে আমরা বলি নানা কথা। তার একটি বড়ো অংশ হচ্ছে বাস্তব কথা, সঙ্গত কথা। কিন্তু বাস্তবতাকে ভাষা দিয়ে ভেঙে দিতে পারি আমরা সবাই। আর যারা মনে মনে পেরিয়ে যাই চারপাশের বাস্তবতা, ঢুকে পড়ি অন্য বাস্তবে, বা অবাস্তবে, তারা বলতে পারি এমন সব কথা, যা শুনে কেঁপে উঠবে চারপাশের বাস্তব মানুষেরা।

কবিরা বাস্তবতাকে পেরিয়ে যান অতি সহজে। তাই তাঁরা বলেন এমন কথা, যা বাস্তবে অসম্ভব, কিন্তু অত্যন্ত সত্য। আবার কেউ কেউ ঢুকে পড়তে পারি কিন্তু উদ্ভট জগতে, যেখানে ঘটে অভাবিত ঘটনা। যেখানে কিম্ভূত ব্যাপার ঘটে দিনরাত। সে-কথা ওই জগতে সত্য, কিন্তু বাস্তব মানুষের কাছে মনে হবে উটের গ্রীবার মতো উদ্ভট। ভাষা খুব চমৎকার ব্যাপার; তার সাহায্যে আমরা বলতে পারি বাস্তব অবাস্তব সবরকম কথা। বাস্তব কথার চেয়ে অবাস্তব কথাই অধিক রঙিন। রঙধনুর সাত রঙ, ভাষার সাত কোটি রঙ।

www.BDeBooks.Com

এসো কবিতা লিখি

কবিতা পড়তে ভালো লাগে। আবার অনেকের ইচ্ছে হয় একটি, দুটি, অনেক কবিতা লিখি। সবার জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন কবিতা লিখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। অনেকেই কবিতা লেখে। তবে সারা জীবন সবাই লেখে না। কেউ একটি-দুটি লিখে ক্লান্ত হয়ে অন্য দিকে চলে যায়। আবার কেউ কেউ আমরণ লেখে। ভালো ভালো কবিতা লেখে, আমরা মুগ্ধ হই। তারা কবি। ইচ্ছে করলে কবি হওয়া যায়, আবার ইচ্ছে করলেই কবি হওয়া যায় না।

কবিতা কী করে লেখা যায়? কী করে ভালো কবিতা লেখা যায়? কী করে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায়? কেউ তা বলতে পারে না। এ-জন্যই কবিতা লেখা নিয়ে অনেক অলৌকিক কথা আছে। আগে লোকেরা এবং কবিরাও মনে করতেন, তাঁদের মধ্যে অলৌকিক কেউ যাদু ছড়িয়ে যায় কথার, তাই তাঁরা কবিতা লিখতে পারেন। একে বলা হয় প্রেরণা। এরকম ভাবার কারণ আছে। কবিতা কেউ চেষ্টা করে লিখতে পারে না, পারলেও খুব বেশি পারে না। কবিতা যেনো অনেকটা মনের ভেতর থেকে উঠে আসে।

কবিতা রচিত হয় ভাব দিয়ে। সেই ভাব টেবিলে বসে বসে হাত পাকিয়ে ধরা যায় না। মনে করো, তোমার গাড়িটা বিকল হয়ে গেছে। তুমি খুঁজে খুঁজে দেখলে কী কী যন্ত্র নষ্ট হয়েছে। শেষে ব'সে ব'সে মেরামত করলে। বা ধরো অনেকখানি কাপড় নিয়ে ব'সে তুমি একটা ট্রাউজার, একটা শার্ট তৈরি করলে। এগুলো তোমার ইচ্ছের অধীন। কিন্তু যে-ভাব কবিতার বিষয়, তা তোমার ইচ্ছের অধীন নয়। তা তুমি ডেকে আনতে পারো না, বাজার থেকে কিনে আনতে পারো না, তুমি ঠুকে ঠুকে তৈরি করতেও পারো না। তবে ভাব আসে। তা আসে তোমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে, মনে গেঁথে থাকে; তুমি যদি কবি হ'তে চাও, তবে তোমার কর্তব্য, ওই ফাঁকে ফাঁকে আসা ভাবনাগুলোকে মনে ধরে রাখা, শেষে টেবিলে ব'সে লিখে ফেলা। তুমি ছোট্ট। ব্যাগ দুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছো, দেখছো একটি নদী, একটি বিশাল মাঠ, সবুজ ঘাস, মাছ। হয়তো তখন তোমার মনে একটি কবিতা এলো। তুমি বড়ো হয়েছো। অফিসে যাবার জন্য শার্ট পরছো, গাড়িতে চলছো, দেখছো, অনেকগুলো লোক, দালানের গায়ে একগুচ্ছ সবুজ ঘাস। হঠাৎ মনে ভেসে এলো তোমার বাল্যকাল, আর সেই সঙ্গে মনে

জন্ম নিল একটি কবিতা। তা তুমি বাসায় এসে লিখে ফেললে। আমি একটি কবিতা লিখবো, এমন আশা নিয়ে টেবিলের কাছে সারাদিন ব'সে থাকলেও কবিতা আসে না। কবিতা আসে বহু কাজের ফাঁকে ফাঁকে। কবিতা আর কারো মতো আসে না, কবিতা আসে কবিতার মতো।

কবিতা লিখতে গেলে অনেক কিছু চাই তোমার। তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও, তবে দরকার তোমার অঙ্কে ভালো মাথা, খাটুনি করার মতো মানসিকতা। তেমনি কবিতা লিখতে গেলে, তোমাকে কিছু কিছু গুণ আয়ত্তে আনতে হবে। তুমি যা দেখবে তা দেখবে স্পষ্ট করে, অন্যদের চেয়ে গভীর ক'রে। তোমার চোখ দেখবে, সেই সঙ্গে দেখবে মন। আর থাকতে হবে ভাষার ওপর অধিকার। যে ভাবই আসুক, প্রকাশ করার উপযুক্ত শব্দ তোমার মনের ভাণ্ডারে থাকা চাই। কবিরা গভীর চোখে সব কিছু দেখেন। সাধারণ মানুষের চোখে যা ধরাই পড়ে না, কবিরা সব দিক থেকে দেখেন; এই দেখা কেবল চোখে দেখা নয়, মনে দেখা। যেমন, ধরা যাক তাজমহলের কথা। তাজমহল খুবই সুন্দর, লাখ লাখ লোক একথা ব'লে আসছে। তাদের সবার কথাই একরকম, সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা আমরা তাদের কথায় পাই, কিন্তু সৌন্দর্য পাই না। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল/এ তাজমহল। তখন মনে হয়, পৃথিবীতে তিনিই যথার্থ তাজমহল দেখেছেন। কেননা তিনি কল্পনা করেছেন তাজমহল যেনো কালের কপোলে শুভ্র সমুজ্জ্বল একবিন্দু অশ্রু। এখানে তাজমহলের সৌন্দর্য এবং তার নির্মাণের বেদনা দুটোই ধরা পড়েছে। এতোক্ষণ যা বলেছি, সবটাই কবিতার ভাব নিয়ে। কিন্তু কেবল ভাব দিয়ে কবিতা হয় না।

ভাবকে শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা চাই। কী করে তা প্রকাশ করা যায়? প্রকাশ করতে না পারলে পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম ভাবনাটিও কবিতা হয় না। কবিরা আসলে কল্পনার সম্রাটই নন, তাঁরা শব্দের যাদুকরও। তাঁদের ভাবনারাশি তাঁরা গেঁথে দেন ছন্দে, আর ওই শব্দমালাই কবিতা। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।

পংক্তিগুলো রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে নেয়া। একটি নির্ঝর ঘুমিয়ে ছিলো। এমনভাবে ঘুমিয়ে ছিলো সে যে আছে, তা সে নিজেই জানতো না। জানতে পারলো একদিন সোনালি ভোরে যখন তার ওপর

www.BDeBooks.Com

রৌদ্রের সোনা ঝরে পড়লো। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙলো, সে চমকে উঠল, আর গান গেয়ে উঠলো জাগরণের। ওপরের চারটি পংক্তিতে নির্ঝরের বিস্ময়চকিত ভাব ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যদি উপযুক্ত ভাষা এবং ছন্দ ব্যবহার করতে না পারতেন, তবে নির্ঝরের স্বপ্ন কোনোদিনই ভাঙতো না। কবিতার শরীর হলো ভাষা এবং ছন্দ। সে কবিই বড়ো কবি, যিনি পারেন তাঁর ভাবকে উপযুক্ত ভাষা দিতে।

আমি একটি কবিতা লিখতে চাই। কী নিয়ে লিখবো? একটি জিনিশ স্বপ্নে দেখেছি, তা নিয়েই লিখবো। স্বপ্ন দেখলাম, বিনু ডেকে বলছে, চেয়ে দেখো, কী ব্যাপারটা ঘ'টে যাচ্ছে। সব কিছুতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, কেননা সাধের শহর কলকাতা নড়তে নড়তে চ'লে যাচ্ছে। সবাই চলছে। বাড়িগুলো, তার দরজা, জানালাগুলোও। অজগরের মতো চলছে রাস্তাগুলো, হাওড়ার ব্রিজ বিছের মতো চলছে। ভাবটা তো হয়ে গেলো। এবার দরকার ভাষাটা। তাও মনে স্থির করা হলো। কিন্তু কোন ছন্দে লেখা যায় কলকাতার এই যাত্রার ইতিকথা? বাঙলা ভাষার তিনটে ছন্দোরীতি আছে : অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত। ভেবে দেখলাম, যে-ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে, তা হচ্ছে, মৃদুতালে, আর ঘটছে অনেক কিছু, বেশ সময় নিয়ে। ব্যাপারটাতে গতি আছে, তবে খুব চঞ্চলতা নেই। তাই চঞ্চল ছন্দ স্বরবৃত্তে একে লিখলে ভালো হবে না। আবার গম্ভীর মাত্রাবৃত্তেও একে মানায় না। মানায় অক্ষরবৃত্তে। কেননা এই ছন্দে অনেক কথা, সব রকম কথা, গুরু চঞ্চল সব কিছু বলা যায়। তাই কবিতাটি লেখা গেলো এভাবে :

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরজা।...
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।

চমৎকার কবিতা! কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। স্বপ্নটা কি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতার মতো একটা শহর হেঁটে চ'লে যাচ্ছে, সেই বিস্ময়কর চেহারাটা এখানে দেখা যায়। কবিতাটির শেষাংশ খুবই চমৎকার। এমন একটা আজগুবি ব্যাপার শেষ হয় এভাবে :

কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

একটি চমৎকার ভাবনা লেখা হয়েছে চমৎকার ভাষায়। তাই এটি চমৎকার কবিতা।

কবিতা লিখতে হলে কবিতার কিছু কলকব্জার খবর রাখা দরকার। তবে কবিতার কলকব্জা কবিতার ব্যাকরণ প'ড়ে জানা যায় না। কবিতা লিখতে হ'লে কবিতা পড়তে হয় বিস্তর। কবিতা, কবিতা, কবিতা কেবল পড়তে হয়। আর বুঝতে হয় কী ক'রে সে-সব কবিতা লেখা হয়েছে। যার মনে আছে কল্পনার আলো, সে সব কিছুতেই কবিতা পাবে। বাতাস, সবুজ গাছ, ছোট্ট পুতুল, মাঠের ঘাস, রাস্তার মানুষ, হরতাল, মিছিল, শহীদ মিনার, লাল ফুল সব কিছুতেই সে কবিতা পেতে পারে। কিন্তু তাকে কবিতা করতে হ'লে চাই তার ভাষা ও ছন্দ। এটা শিখে নিতে হয় বহু যত্নে। কবিতার মতো লেখা মাত্রই কবিতা নয়। বছর বছর যতো কবিতা লেখা হয়, তার দশভাগও কবিতা নয়া কবিদেরও অনেকে কবিই নন। প্রকৃত কবি আর কবিতা খুবই কম।

www.BDeBooks.Com

এক পয়সার বাঁশি

সবুজ গ্রামের মত ছোট্ট, মিষ্টি একটি দেশ। নাম তার বাঙলাদেশ। এদেশের আকাশে বকের পাখার মতো শাদা চাঁদ ওঠে। মাঠে মাঠে বেজে ওঠে রাখালের বাঁশের বাঁশি। রুপোর শাদা রেখার মতো নদী বয়ে যায় এদেশে। নদীতে নদীতে নৌকো ভাসে, আর নৌকো বেয়ে মাঝিরা গায় কতো রকমের গান। এমন সুন্দর সবুজ দেশে জন্ম নিয়েছিলেন এক কবি। তিনি ভালোবাসতেন সবুজ গ্রাম, রুপোলি নদী, ধু-ধু করা মাঠ, সরষে খেত, বালুর চর, পুকুরের কালো জল, রাখালের বাঁশি। বাঁশের বাঁশির সুর যেমন মিষ্টি, তেমনি মিষ্টি সুরে তিনি সারা জীবন আমাদের গ্রামের কথা বলেছেন। গ্রামের মানুষের সুখের কথা লিখেছেন, তাদের কান্নার কবিতা লিখেছেন।

গ্রাম তাঁর খুব ভালো লাগতো। গাছপালা তাঁকে আনন্দ দিতো বাঙলাদেশের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করতো। আকাশের দিকে তাকালে তিনি দেখতে পেতেন নানা রকমের মেঘ। তাঁর চোখে পড়তো কালো মেঘ, ফুল-তোলা মেঘ, ধুলট মেঘ, তুলট মেঘ, কানা মেঘ, কাজল মেঘ। বর্ষা এলেই তাঁর চোখে পড়তো কদম ফুল ফুটেছে হলদে হয়ে, বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাচ্ছে লাল রঙের হিজল ফুল। গ্রামের দিকে তাকালে তাঁর মনে হতো যেন গ্রাম সবুজ দিয়ে ঘেরা আর তার মাথায় নেমে পড়েছে নীল আকাশ। সেখানে কলাপাতা একবার এদিকে আরেকবার ও সেদিকে দুলে বাতাস করে। সকালে রুপোলি শিশির ধুয়ে দেয় সকলের পা। সেখানে ছোটো ছোটো ঘরগুলো যেন সোনার পাতায় তৈরি, আর আকাশে ভেসে বেড়ায় মেঘের রঙিন নৌকো। গ্রামের গাছপালা লতাপাতাও নিমন্ত্রণ জানায় সকলকে।

বাঙলার পল্লীকে খুব ভাল বাসতেন সেই কবি। কবিতায় তিনি লিখতেন পল্লীর রূপের কথা, পল্লীর মানুষের সুখের কথা আর কান্নার কথা। কখনো লিখতেন খুব বড়ো বড়ো কবিতায়, কখনো ছোটো ছোটো কবিতায়। তাই আদর ক'রে সবাই বলতো তাঁকে পল্লীকবি। তিনি তাঁর এ-ডাকনামটি পছন্দ করতেন খুব। যারা বয়সে খুব ছোটো, তাদের জন্যও তিনি কবিতা লিখেছেন। একবার হাসু নামের একটি ছোট্ট মিষ্টি, স্বপ্নের মতো মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিলো পল্লীকবির। তিনি হাসুকে ভালোবাসতেন খুব। তাই তিনি লিখেছিলেন *হাসু* নামে একটি কবিতার বই। ছোটোদের জন্যে তিনি

আরো একটি মধুর বই লিখেছিলেন। বইটির নামটি ভীষণ সুন্দর : *এক পয়সার বাঁশি।* বাঁশিটির দাম খুব সস্তা, মাত্র এক পয়সা; কিন্তু তার সুরের দাম কোটি কোটি সোনালি টাকার চেয়েও বেশি। সেই কবি ছিলেন কবিতার রাখাল।

কবির নাম জসীমউদ্‌দীন। তার পিতার নাম আনসারউদ্দীন আহমদ, আর মায়ের ডাক নাম ছিলো রাঙাছুটু। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৩ সালে, ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা নামে এক গ্রামে। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। তাঁর সুন্দর সবুজ দেশ থেকে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন ১৯৭৬ সালে। কিন্তু তাঁর কবিতা তোমাদের জন্য বেঁচে আছে।

www.BDeBooks.Com

লাল নীল ছড়া

মানুষের বাল্যকালটা, যে-সময়ে আমরা বেশ ছোটো থাকি, খুব রঙিন হয়। লাল-নীল-বেগুনি-হলুদ-হাজার রকমের রঙ তার। সে-সময়ে আমাদের সব কিছু ভালো লাগে, আকাশের ঘুড়ি, সবুজ পাতা চঞ্চল ফড়িং, রঙিন প্রজাপতি, সব কিছু ভালো লাগে। কেনো ভালো লাগে? কেননা, এসব জিনিশ তখন আমাদের মনে নানা রঙের ছবি আঁকে। এমন সুন্দর রঙিন বাল্যকালে আরো একটি জিনিশ লক্ষ রকমের রঙ ছড়ায় আর সুর ঝরায়। সে-জিনিশটি হলো ছড়া। ছড়া বড়ো মজার, সে এক মায়াবী যাদুকব। আমাদের সারাটি বাল্যকাল কাটে ছড়ার যাদুমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ক'রে। যখন আমরা খুব ছোট্ট, দোলনায় দুলি, কোনো কথা বলতে পারি না, গান গাইতে পারি না; মা, বাবা, আপা আমাদের ছড়া শোনান। তারপর আমরা বড়ো হই, ছড়া কাটতে শিখি। কে এমন আছে যে ছোট্ট বয়সে মাথা দুলিয়ে চুল উড়িয়ে ছড়া কাটে নি? এমন কেউ নেই। কেউ নেই।

ছড়ার যাদু আছে। তাই তার অর্থ বুঝতে হয় না, কেবল সুর ক'রে গান গেয়ে নাচলেই চলে। অনেক ছড়া আছে, যার এক পংক্তির অর্থ বোঝা যায় তো আরেক পংক্তির অর্থ বোঝা যায় না। কেমন যেনো আবোলতাবোল মিষ্টি মনে হয়। বোঝা যায় না। তবু মিষ্টি মনে হয়। এর কারণ হলো, ছড়া অর্থের জন্যে নয়, ছড়া ছন্দের জন্যে, ছড়া সুরের জন্যে। অনেক আবোলতাবোল কথা থাকে ছড়ার মধ্যে, সে-আবোলতাবোল কথাই মধুর হয়ে ওঠে ছন্দের জন্যে, সুরের জন্যে।

ছড়ায় প্রথম যাদু লুকিয়ে থাকে তার মন মাতানো ছন্দে আর সুরে। উচ্চারণ করতে করতে মনে হয়, যেন আমরা মিষ্টি মধুর কিছু চিবুচ্ছি। ছড়ায় যে ছন্দ থাকে, তার নাম স্বরবৃত্ত। এর নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর এর নাচ। সে নেচে যায় আর ঝলমল ঝলমল ক'রে তার নুপুর বাজতে থাকে। এ জন্যে যে ছড়া পড়ে তাকেও নাচতে হয় সাথে সাথে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে নাচে আর কেউ নাচে মনে মনে। এ-রকম একটি মধুর ছড়ার দুটি পংক্তি :

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঝাঁঝর কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে

এর অর্থ বোঝার কোনো দরকার নেই। তোমাকে যদি কেউ এর অর্থ বলতে বলে, তবে তুমি তার কথায় কান দিয়ো না। তুমি কেবল এর মিষ্টি নাচে মত্ত হও, এর ভেতর যে কোনো অর্থ থাকতে পারে সে কথা একেবারে ভুলে যাও। শুধু এর ছন্দ ও সুরের যাদুতে তুমি নাচো এবং নাচো।

তবে ছড়ায় কোনো অর্থ থাকে না, একথা কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। ছড়ায় অর্থ থাকে গোপনে, অনেক তলায় লুকিয়ে, সহজে তা ধরা দিতে চায় না। এমন একটি ছড়া, যার ভেতর অনেক অশ্রুজল লুকিয়ে আছে, শোনাচ্ছি:

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কী
আর ক'টা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।

এটি ঘুমপাড়ানো ছড়া। এটি আবৃত্তি করলেই দু-চোখে শ্যামল ঘুম এসে যায়। এটির ছন্দ নাচের চঞ্চল ছন্দ নয়, এর চরণে চরণে রয়েছে স্বপ্নভরা ঘুমের আবেগ। কিন্তু এ-ছড়াটি ভ'রে আছে কান্না। এর ভেতর ছিন্ন সুতোর মতো রয়ে গেছে বর্গিদের অত্যাচারের কথা। বর্গিরা একদা বাঙলার উপকুল অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব পেতেছিলো। ছড়াটির মধ্যে আছে বর্গিদের সে-অত্যাচারের কথা। এভাবে ছড়ার মধ্যে অর্থ থাকে গোপনে ঘুমিয়ে, অনেক আদর করে তাকে জাগাতে হয়। ছড়ার অর্থও শিশুদের মতোই ঘুমিয়ে থাকতে ভালোবাসে।

তবে ছড়া আজকাল অনেক বদলে গেছে। ছড়া রচনা করেন যে-কবিরা, তাঁরা আজ আর অর্থহীন কথার সুর ছড়াতে চান না। তাঁরা স্বপ্নের ফুল ফোটানোর সাথে সাথে বাস্তবের আগুনও জ্বালাতে চান। এজন্য ছড়া আজ বিচিত্র; অর্থহীন, স্বপ্নময়, জ্বালাময় অনেক রকমের ছড়া আজ আছে আমাদের। ছড়া লেখকেরা আজকাল আকাশের গায়ে টক্‌টক্ গন্ধ পান, ঠাস ঠাস ক'রে ফুল ফোটার শব্দ শোনেন, এমন চমৎকার সাপের সাথে দেখা করেন যে সাপ করে নাকো ফোঁসফাঁস মারে নাকো ঢুসঢাস।

ছড়া সবাইকে মোহিত করে। তোমরা হেমিলনের বাঁশিঅলার কথা শুনেছো। আজ সে-মায়াবী বাঁশিঅলা আর নেই। তাই তোমরা যাবে কার সাথে? যদি জিজ্ঞেস করো, তবে বলবো, নিশ্চয়ই যাবে ছড়ার সাথে। তার বাঁশি আছে, তার যাদু আছে। তার সুর আছে, তার নুপুর আছে।

www.BDeBooks.Com

বুকপকেটে জোনাকিপোকা : শব্দগুলো

যিনি ছবি আঁকেন, তাঁর হাতে আছে কী কী জিনিশ? তাঁর হাতে আছে বুক-আলো-করা বিভিন্ন রকমের রঙ : শাদা লাল নীল বেগুনি হলুদ এবং আরো কতো কী! তিনি যখন ছবি আঁকতে চান, তখন পটের উপর নিপুণ আঙুলে ছোঁয়ান বিভিন্ন রঙ : আমাদের চোখের সামনে, বুকের ভেতর, মোমবাতির আলোর মতো নিবিড় হয়ে জ্বলে ওঠে এক-একটি ছবি। একজন শিল্পীর সাধ হলো ছবি আঁকার। তিনি আঁকতে চান সন্ধ্যার মেঘমালা এবং টুকটুকে লাল কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ। তিনি, মনের মতো ক'রে, বিভিন্ন রকমের রঙ ছড়িয়ে যান পটের ওপর, আর ফুটে ওঠে এক একটি ছবি। রঙ কিন্তু চমৎকার যাদুকর। সে মেঘ ডেকে আনতে পারে পটের ওপর, কৃষ্ণচূড়া ফোটাতে পারে ক্যানভাসে। কিন্তু, যিনি কবিতা লেখেন, যাঁকে বলি কবি, তাঁর কী সম্পদ আছে? তাঁর হাতে রঙ নেই, আছে কিছু শব্দ, যে-শব্দ আমরা প্রতিদিন ব্যবহার ক'রে যাচ্ছি। শব্দ আমরা সবাই ব্যবহার করি। শব্দ ব্যবহার হয় সবখানে : খুকুমনির পুতুল খেলায়, ভাইয়ার কোলাহলে, আপার গানে, আর ক্রিকেট খেলার আনন্দে। আর সেই শব্দ দিয়েই কবিকে লিখতে হয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যখন মেঘের ছবি আঁকেন, তখন তাঁকে ব্যবহার করতে হয় শব্দ; নজরুল যখন বিদ্রোহ করেন, তখনও তাঁকে ব্যবহার করতে হয় শব্দ। শব্দের কোনো রঙ নেই, গন্ধ নেই, কিন্তু এই শব্দ দিয়েই কবিকে সৃষ্টি করতে হয় রঙের মেলা, সুগন্ধের বাগান।

তাই কবির কাছে শব্দের মূল্য সবচেয়ে বেশি। যিনি শব্দকে জানেন না পরম আত্মীয়ের মতো, তাঁর পক্ষে বড়ো কবি হওয়া সম্ভব নয়। শব্দগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে সেগুলো জ্বলে ওঠে জোনাকির মতো, মনের মধ্যে, বনের মধ্যে, হৃদয়ের বুক পকেটের মধ্যে। কবিতার মধ্যে জ্বলে শব্দমালা, তার আলোতেই তো মুগ্ধ হই আমরা।

কবি কোলরিজ কবিতা কাকে বলে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, কবিতা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম শব্দের উৎকৃষ্টতম বিন্যাস। আমরা, যারা সাধারণভাবে কবিতা পড়ি, অর্থ বা ভাব খুঁজে থাকি। আর বহু খোঁজাখুঁজির পরে, যদি কিছুতেই এক টুকরো ভাব বের করতে না পারি, তখন চিৎকার ক'রে বলি, এটি কবিতা নয়। আমাদের অনেকের বিশ্বাস, ভাব'ই হচ্ছে কবিতা। ফরাশি দেশের এক নামকরা কবি মালার্মে কথাটাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে,

ভাব দিয়ে কবিতা হয় না, কবিতা হয় শব্দ দিয়ে। দেখা গেছে, বুকের মধ্যে ভাবের অভাব নেই, কিন্তু যেই লিখতে বসলাম, তখন চঞ্চল ভাবগুলো যে কোথায় পালালো। এ রকম কেনো হয়? তার কারণ হলো বুকের মধ্যে যে ভাবগুলো গান গায়, দুঃখ পায়, সেগুলো অসজ্জিত, অবিন্যস্ত। তাকে বিন্যস্ত করতে হয় শব্দে। তাই, সেই শব্দমালার ওপর যদি রাজার মতো অধিকার না থাকে, তবে বুকের ওই ভীষণ গুঞ্জনও মূল্য পাবে না। এজন্যে বড়ো কবি মানেই হলো শব্দের বড়ো রাজা, যাঁর কথায় শব্দগুলো মুহূর্তে পুষ্প হয়, মুহূর্তে নদী হয়, মুহূর্তে বৃষ্টি ঝরায়, আবার পরমুহূর্তে রৌদ্রে ভরে দেয় সারা দেশ!

তবে মনে রাখতে হবে একটি কথা। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিধানে মুদ্রিত শব্দ যদিও এক, তবুও এক নয়। অভিধানে শব্দের অর্থটা শুধু দেয়া থাকে। সেই অর্থ সীমিত; প্রাণহীন। কবিতায় যখন শব্দ বসে, তখন তা কবির হৃদয়ের আবেগে নতুন প্রাণ পায়, তার প্রচলিত অর্থ ছাড়াও আরো বহু অর্থ তার গায়ে এসে জমা হয়। কেননা, কবিতায় কবি কেবল বর্ণনা দেন না, নিজের হৃদয়টাকেও প্রকাশ করেন। একটি উদাহরণ দেখি। কয়েকটি শব্দ নেয়া যাক : জল, পাতা, পড়ে, নড়ে। এখানে চারটি অত্যন্ত সহজ, সরল শব্দ আছে, এগুলোর অর্থ সবাই জানি। এগুলো ওপরে যে-ভাবে সাজানো হয়েছে, তা পড়ে সবচেয়ে আবেগী লোকটিও মুগ্ধ হবে না। কিন্তু যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শব্দগুলো সাজান এভাবে : জল পড়ে। পাতা নড়ে। তখন? বাল্যকালে এভাবে সাজানো এ চারটি শব্দ প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের কী মনে হয়েছিলো জানো? তিনি লিখেছেন, এই শব্দ চারটি পড়ার পরে, তাঁর মনে হলো, তাঁর মনে যেনো অনবরত জল পড়তে এবং পাতা নড়তে লাগলো। অভিধান থেকে বের হয়ে যখন শব্দ এসে বসে কবিতায়, তখন এমনই রূপান্তর হয় তার।

কবিরা শব্দের শরীরে নানা রকমে প্রাণ সঞ্চার করতে চান। আমরা যখন এক-একটি শব্দ উচ্চারণ করি, তখন নানা রকমের ধ্বনি ও সুর সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনিগুলোকে কবিরা সুব্যবহার করেন, তাঁরা শব্দগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে এবং বাজিয়ে দেন যে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। যেমন :

১. তুলতুল টুকটুকু
টুকটুক তুলতুল।
কোন্ ফুল তার তুল।
তার তুল কোন্ ফুল।

www.BDeBooks.Com

টুকটুক রঙ্গন।
কিংশুক ফুল্ল।
নয় নয় নিশ্চয়।
নয় তার তুল্য।

২. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ

৩. মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল।

প্রথম উদাহরণটিতে একই শ্রেণীর শব্দ বারবার ব'সে চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়েছে সবখানে। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে [চ] ধ্বনিটি ও [রণ] ধ্বনি, এবং তৃতীয় উদাহরণে [ঞ্চল] ধ্বনি যে-সুর সৃষ্টি করেছে, তা সবারই কানে সুর তোলে। তবে এ-ধ্বনির খেলা বেশিক্ষণ খেলা যায় না। তাতে কান পীড়া বোধ করে। তা ছাড়া কবিদের কাজ তো কেবল ধ্বনি বাজানো নয়, জীবনের সবটা তাঁরা তুলে ধরতে চান। জীবন অপরিসীম, শব্দ সসীম। তাই জীবনের অপরিসীমাকে রূপ দিতে গিয়ে কবিরা নানাভাবে শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন একজন কবি লেখেন : সবুজ বাতাস, গভীর হাওয়া। বাতাস কি কখনো সবুজ হয়? হয় না। কবি চান, সবুজ জমির ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া বাতাস, বাতাসের শীতলতা, কিন্তু তিনি জমিটিকে উল্লেখ করতে চান না। তাই রঙহীন বাতাসের আগে এসেছে 'সবুজ' বিশেষণ। অমনি আমাদের অনুভূতি প্রসারিত হয়েছে। এরকম ব্যাপারই ঘটেছে 'হাওয়া' শব্দটির আগে 'গভীর' বিশেষণ ব্যবহারের ফলে। জলকেই আমরা গভীর জেনে এসেছি, কিন্তু কবি এখানে 'গভীর হাওয়া' বলে বাতাসের মধ্যে সমুদ্রের আভাস আনতে চেয়েছেন।

এভাবেই শব্দ খেলা করে কবিতায়। যার ইচ্ছে আছে কবি হবার, তাকে যত্নে শিখে নিতে হবে শব্দ-জোনাকিগুলো ধরার কৌশল। তবেই তা আলো দেবে সবখানে : কবিতায়, মনে, বনে, সুখে, দুঃখে, জীবনের সবগুলো বুকপকেটে।

ছোটো ছোটো পাখি মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন

পাখিদের দিকে তাকালে আমার মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। ছোটো ছোটো পাখিদের দিকে তাকালে মনে হয় দেখছি মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন। জেগে জেগে যখন আমি স্বপ্ন দেখতে চাই, তখন তাকাই পাখিদের দিকে। তাকাই চড়ুইয়ের দিকে, টুনটুনির দিকে, দোয়েলের দিকে; বাবুই আর ডাহুক আর বক আর প্যাঁচা আর শালিক আর চিল আর কবুতর আর ঘুঘুর দিকে। জেগে জেগে দেখতে পাই মিষ্টি মিষ্টি ছোটো ছোটো সবুজ সবুজ হলুদ হলুদ শাদা শাদা স্বপ্ন।

যে-পাখিগুলোকে এখন আর আমি চোখ মেললেই দেখতে পাই না, যেগুলো এখন আমার থেকে অনেক দূরে, আর আমি যেগুলোর থেকে অনেক দূরে, সেগুলোর মুখের ঠোঁটের ডানার দিকে আমি তাকাই চোখ বুজে। স্বপ্নের মতো দেখতে পাই ওই ছোটো ছোটো মিষ্টি মিষ্টি পাখিদের। দেখি আর শুনি টুনটুন করছে টুনটুনি শাদা বেগুনের ডালে। দেখি দোয়েল ঘুমিয়ে আছে আমের পাতার সবুজ মেঘের ভেতরে। কচুরিপানার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ডাহুক। খেজুর ডালে বাবুই বানাচ্ছে তার শিল্পিত কুঁড়েঘর। বক উড়ে বসছে, মাছরাঙা ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে, ঘুঘু ডাকছে চৈত্রের বাঁশবাগানে, শুনতে পাই কোকিলের গান। দেখতে পাই টুকরো টুকরো মেঘের মতো অসংখ্য কাকের ওড়াউড়ি।

পাখি হচ্ছে আমার ছেলেবেলা। পাখির কথা মনে হলেই চলে যাই ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় গেলেই দেখি আমাকে ঘিরে আছে আমার পাখিরা। ছোটো ছোটো পাখিরা। ছোটোই আমার কাছে সুন্দর ছোটোই আমার কাছে মিষ্টি। বড়ো বড়ো বিখ্যাত পাখি আমি বেশি দেখি নি। বিখ্যাত পাখিদের জন্যে আমার কোনো মোহ নেই। ভালোবাসা নেই। আমাদের বেগুন ডালে কখনো ময়ূর বসতো না। আমাদের হিজল ডালে কখনো ঈগল বসে নি। আমার আকাশে কখনো বাজপাখি ওড়ে নি। আমার ছেলেবেলার মতোই ছোটো আর মিষ্টি আমার পাখিরা।

আমাদের শাদা বেগুনের ডালে টুনটুন করছে এক চঞ্চলতা। তার নাম টুনটুনি। উড়ছে আর উড়ছে, আর টুনটুন করছে। একরত্তি মাংসের ওপর দুটো ডানা আর সামান্য পালক হচ্ছে টুনটুনি। এতো সুন্দর পাখি আর হয় না। আমার কাছে ময়ূরের থেকে অনেক সুন্দর টুনটুনি। একটি পাখিকে

www.BDeBooks.Com

আমরা বলতাম দইকুলি। ঘুমের মতো পাখিটি, দেখলেই মনে হতো ঘুমিয়ে আছে। বুকটি তার এতো শাদা যে তার পাশে দুধকেও যেনো কালো মনে হতো। অনেক পরে জানতে পারি ওরই নাম দোয়েল। আমি জানতাম ওর নাম দইকুলি। এখনো আমি ওকে দইকুলিই বলি। দইকুলি জানে না সে আমার হৃদয়ের পাখি। অন্যদের কাছে জাতীয় পাখি।

একটি পাখির কাছে অনেক অপরাধ করেছি আমি। তার কাছে আমি প্রত্যেক দিন মনে মনে ক্ষমা চাই। কেউ তাকে ভালোবাসে না, আমি মনে মনে তাকে ভালোবাসি। সে কাক। পাখিদের মধ্যে সব পাখিই বনের, শুধু কাক হচ্ছে সমাজের। খুব সামাজিক পাখি কাক, রাজনীতিক পাখিও। মানুষ ছাড়া কাক সুখ পায় না। মানুষ না থাকলেও কোকিলের চলতো, ঘুঘু ডাহুক দোয়েল বুলবুলি ময়ূরের চলতো। কিন্তু কাকের চলতো না। কাক মানুষের প্রতিবেশী।

ছেলেবেলায় কাকের অনেক বাসা ভেঙেছি। পেড়ে এনেছি সুন্দর নীল নীল ডিম। বাচ্চাও পেড়েছি। তাই কাক দেখলেই আমার মন অপরাধবোধে ভরে যায়। মনে মনে বলি : কাক, আমাকে ক্ষমা করো। কাক সামাজিক, তাই সামাজিক একটি ব্যাপার সে জানে। সে জানে লড়াই করতে। আমরা কাকের বাচ্চা পেড়ে আনার পর দেখতাম অসংখ্য কাকে চারপাশ ছেয়ে গেছে। ভয়ঙ্করভাবে ডাকছে তারা। যেনো লড়াইয়ে নেমেছে। ঠোকর দিচ্ছে আমাদের মাথায়। কাকের বাচ্চা পাড়ার দুপুরে আমরা আর ঘর থেকে বেরোতে পারতাম না। মাথা ছিদ্র হয়ে যেতো কাকের ঠোকরে। কাক ছাড়া আর কোন পাখি লড়াই করে কার বাচ্চার জন্যে? কাকই একমাত্র পাখি যে ভালোবাসে তার বাচ্চাদের। ভালোবাসে বলে লড়াই করে।

খেজুর ডালে ঝুলতো বাবুই পাখিরা, ঝুলতো তাদের বাসা। বাবুই পাখি শিল্পী, তার বাসা এক শিল্পকলা। বাসার দরোজায় বসে বাবুই যখন তাকাতো আমাদের দিকে, ইচ্ছে হতো বাবুই হয়ে খেজুর ডালে গিয়ে বাসা বানিয়ে থাকি। দিনরাত দুলি। একটি কবিতায় চড়ুই বাবুইকে খোটা দিয়ে বলেছে : কুঁড়েঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই। খুব সত্যিকথা বলেছে চড়ুই। বাবুই তো শিল্পী, খড়কুটোর কবি, সে তো কুঁড়েঘরেই থাকবে। কিন্তু শিল্পের গৌরব সে করতে পারে। বাবুই ভালোবাসে দলবেঁধে উড়তে আর ডাকতে। আমি আজো আমার ছেলেবেলার বিকেলের বাবুই পাখির এলোমেলো ডাক শুনে চমকে উঠি। ওই ছোটো পালকের বলের মতো পাখিটুকুর ভেতরে কেমন করে থাকে এমন সুন্দর জটিল বাসা বানানোর শিল্পকলা?

প্যাঁচা আমি কম দেখেছি, কিন্তু একবার লক্ষ্মীপ্যাঁচা দেখে ভ'রে গিয়েছিলো আমার চোখ আর বুক। এতো সুন্দর যে কিছু আছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা দেখার আগে আমি তা ভাবতে পারিনি। তার মুখ আর চোখ আর পালকের সাজ দেখে চোখ নিশ্চল হয়ে যেতে চায়। আর সব পাখি হচ্ছে চঞ্চলতা, প্যাঁচা হচ্ছে ধ্যান। সে এসে বসলো, দিনভর একটুও নড়লো না। মুখ গুঁজে বসে রইলো। তবে মানুষের সমাজে ধ্যান করা কঠিন কাজ, কর্মী সামাজিক মানুষেরা ধ্যান ভাঙিয়ে দেবেই। কবি বিহারীলাল লিখেছেন : তপোবন ধ্যানে থাকি এ-নগর কোলাহলে। ওই লক্ষ্মীপ্যাঁচাটিকে দেখে সে কথা মনে হয়েছে আমার। প্যাঁচাটি কিছুতেই ধ্যান করতে পারছিলো না, তার পায়ের ইঁদুরের লোভে সামাজিক কাকদের চিৎকারে বারবার ভেঙে যাচ্ছিলো তার ধ্যান। তাই সে যে কোথায় চলে গেলো! হয়তো তপোবনে। ধ্যান খুব মহৎ কাজ, তবে ধ্যানের সময়ও পায়ে একটা ইঁদুর গাঁথা থাকতে হয়!

একটি শালিকের দুঃখে কয়েক মাস ধ'রে আমার বুক ভ'রে আছে। বলা হয় ক্রৌঞ্চের বেদনায় কাতর হয়ে কবি বাল্মীকি লিখেছিলেন প্রথম কবিতা। তবে আমি শালিকটি নিয়ে কবিতা লিখি নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ঘরের জানালার একটি কাচ ভেঙে গেছে। জানালার পাশে রয়েছে একটি কাগজের বাক্স। ওই দিকটি আলমারি দিয়ে ঢাকা। কয়েক মাস আগে ওই দিকে আমি একটি শালিকের গলা শুনতে পাই। প্রতিদিনই শুনতে পাই। শালিকটি বাসা বেঁধেছে বাক্সটিতে।

একদিন একটু বেশি খুশি খুশি গলা শুনে গিয়ে দেখি দুটি বাচ্চা ফুটেছে। দু-দিন পর প্রচণ্ড ডানার ঝাপটানো আর কান্না শুনে গিয়ে দেখি বাচ্চা দুটি নিচে প'ড়ে গেছে। আমি বাচ্চা দুটিকে বাক্সে উঠিয়ে দিই। বিস্কুট গুঁড়ো ক'রে খেতে দিই। দু-দিন পর আবার প্রচণ্ড চিৎকার আর ডানার ঝাপটানো শুনে গিয়ে দেখি বাচ্চা দুটি নিচে পড়ে ম'রে আছে। আমি বাচ্চা দুটি তুলে নিচে ফেলে দিই। কী আর করতে পারতাম আমি? কিন্তু অনেক অবুঝের মতো শালিকটি আমাকে ক্ষমা করে নি। সে জানালায় এসে বারবার ডানা ঝাপটাতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। যেনো আমিই মেরেছি ওর বাচ্চা। কী ক'রে ওকে বোঝাই যে আমি মারি নি ওর বাচ্চা! মানুষকেই আমি কতো কিছু বোঝাতে পারি নি, কি ক'রে বোঝাই শোকাতুর শালিককে!

ওর ডানার ঝাপটানো আর কান্নার বাড়াবাড়ি দেখে শেষে আমার রাগ ধরে। আমি ওকে শুনিয়ে বলতে থাকি : হে শহুরে শালিক, তুমি আমার গ্রামের শালিকের মতো নও। তুমি বড়ো বড়ো দালান আর টেলিভিশন

www.BDeBooks.Com

দেখে দেখে খারাপ হয়ে গেছো। তুমি শহরে এসে বাসা বানাতে ভুলে গেছো। তুমি সবুজ গাছে বাসা না বেঁধে আমার ঘরে বস্তি বানিয়েছো। এখন বেশি দুঃখের অভিনয় করছো। তারপর আর তার কান্নাকাটি শুনি নি। তাকে এবার আর আমার ঘরে বস্তি বানাতে দেবো না। পাখিকে আবার আমি পাখি ক'রে তুলবো। তাকে দিয়ে বাসা বাঁধাবো সবুজ গাছে। তবু তার দুঃখে আমার বুক মাঝেমাঝে কেঁপে ওঠে। শালিকের বুকেও হৃদয় আছে, পাখির চোখেও অশ্রু জমে।

আমার ছোটো ছোটো পাখিরা ছেলেবেলায় আমাকে সুখ দিতো। আজো সুখ দেয়। আমার চোখ যখন অন্ধ হয়ে আসে তখন আমি ওই ছোটো পাখিদের দিকে তাকাই। আমার কান যখন বধির হয়ে আসে তখন আমি পাখিদের ছোটোছোটো স্বরের দিকে কান পাতি। আমার চোখ সুখ পায়, আমার কান সুখ পায়। আমি সুখ পাই।

শব্দ থেকে কবিতা

কবিতা কাকে বলে বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম বেশ কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপা হয়, যে-লেখাগুলোর পংক্তিগুলো খুব বেশি বড়ো হয় না, যেগুলোতে একটি পংক্তি আরেকটি পংক্তির সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে, গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রঙ-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা। কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিশ লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিশ চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ : রঙবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হ'তে পারে কে? সে-ই হ'তে পারে কবি, লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর ক'রে যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও। তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নূপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও, তবে তোমাকে ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমার জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রঙ আছে। তোমার চিনতে হবে

www.BDeBooks.Com

শব্দের রঙ। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়: কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নূপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাঙলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠাল চাঁপার ঘ্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবি লেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রঙ, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হ'তে হবে। যা একবার কেউ ব'লে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ আর শব্দ।

যে-কোনো বিষয় নিয়েই লিখতে পারি কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধান খেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে শাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিশ আমরা কিনে খাই,

দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিশপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো : আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে- কিন্তু সে দোকানে দুধ, চকোলেট, পানি বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিশ, যা কেউ বেঁচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সে-সব জিনিশ বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো আর ছন্দ। প্রথমে লিখলাম :

দুদিন ধ'রে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে : চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পংক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ ও কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরো এগিয়ে গিয়ে লিখলাম:

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরো মধুর। বিক্রির জিনিশগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরো বেড়েছে, ছবিও আরো রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেলো এবং বেজে উঠলো স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। 'গোলাপ ফুলের মুখের রূপ' বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠলো। মেয়েটির মুখ হয়ে উঠলো গোলাপ আর গোলাপ হয়ে উঠলো মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটি আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পারো। কবিতা লিখতে হ'লেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোটো, এ-ছোটো থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোটো সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই : ছোটো আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা শাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেলো পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেলো, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

www.BDeBooks.Com

তোমরা এখন ছোটো, এ-বয়সে তোমরা খুব বেশি ক'রে দেখে নেবে। যতো পারো দেখো। দেখো দেখো এবং দেখো। বুকের মধ্যে মনের মধ্যে ছবি জমাও রঙ জমাও সুর জমাও। বড়ো হ'লে এ-ছবি, সুর, রঙ তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোটো বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? তুমি কি আজই বসে যাবে কবিতা লিখতে? আজ বোসো না, অপেক্ষা করো। ছোটো বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করলে মনে খুব কাঁচা কথা আসে, ভাবতে ইচ্ছা করে না এবং বড়ো হলেও ছেলেমানুষি কাটে না। ছোটো বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া, এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোটো বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন যখন বড়ো হবে, ছন্দ, ছবি, সুর, রঙ সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে। বলবে : আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে ব'সে শব্দ ছন্দ ছবি সুর রঙ মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিশ, যার নাম কবিতা।

স্বাধীনতার কথা কেনো আমাদের এতো বেশি মনে পড়ে

কিছু কিছু জিনিশ বা কারো কারো কথা আমাদের খুব মনে পড়ে। মাকে খুব মনে পড়ে, দেশের কথা খুব মনে পড়ে, স্বাধীনতার কথা মনে পড়ে। কেনো এতো মনে পড়ে? খুব মনে পড়ে তার কথা যাকে আমরা খুব ভালোবাসি। যখন জেগে থাকি, তখন মনে পড়ে। যখন ঘুমোই তখন মনে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে তখন মনে পড়ে। যাকে ভালোবাসি তার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা জীবনযাপন করি। চোখ ভরে শুধু তার মুখ মনে পড়ে। যেমন মাকে মনে পড়ে। দেশকে মনে পড়ে। স্বাধীনতাকে মনে পড়ে।

এতো মনে পড়ার শুরুতে আছে ভালোবাসা, শেষে আছে ভয়। ভয়ই মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের ভালাবাসার ধনদের কথা। মার কথা শিশুদের খুব মনে পড়ে। শিশু ছোটো, পৃথিবীকে জানে না। তার জগতকে ঘিরে আছে ভালোবাসা আর ভয়। সারাক্ষণ তার মনে হয় মা বুঝি হারিয়ে যাবে, মা বুঝি হারিয়ে যাবে। তাকে আর পাবো না। তাহলে আমি কোথায় থাকবো? তাহলে আমি কার বুকে থাকবো? তাহলে আমি ঘুমোবো কার বুকে? ভয়ে শিশু মাকে আরো ভালোবাসে আরো ভালোবাসে। তাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মারও মনে পড়ে শিশুর কথা, সারাক্ষণ মনে পড়ে। মা জানে তার শিশু খুব ছোটো, পৃথিবীকে জানে না। এই বুঝি সে হারিয়ে যাবে। এই বুঝি তাকে ছেড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি অনন্তে হারিয়ে যাবে। তাই মা আর শিশু একে অপরকে ভেবে ভেবে অধীর হয়।

শিশু যখন একটু বড়ো হয়, আরো বড়ো হয়, তখন মাকে অতো মনে পড়ে না। কারণ সে আর মাকে হারানোর ভয়ে থাকে না। সে জানে মা আছে। খুব আকস্মিক খারাপ কিছু না ঘটলে মা থাকবে। ঘরে ফিরে সে মাকে দেখবে। না দেখলেও তার ভয় নেই। মা কোথায় আছে জেনেই সে নির্ভয়ে থাকে। বড়ো হওয়ার পর তো আমরা মাসের পর মাস বছরের পর বছর মাকে না দেখে থাকি। ভয় তো পাই না। কারণ জানি মাকে হারানোর ভয় কেটে গেছে। যখন আমরা নিশ্চিত হই কোনো কিছু সম্পর্কে তখন আর সারাক্ষণ মনের ভেতরে ভয়ের কাঁপন লাগে না। নিশ্চয়তা মানুষকে সুস্থ

www.BDeBooks.Com

করে। সবল করে। বিকশিত করে। অনিশ্চয়তা মানুষকে ক'রে রাখে অসহায়। ভীত। দুর্বল। অবিকশিত।

দেশের কথা আমাদের খুব মনে পড়ে। আমাদের মন সবসময়ই বাঙলাদেশের নাম জপতে থাকে। শিশু যেমন জপ করে মা শব্দটি, তেমনি গানে গানে আমরা বাঙলাদেশের রূপ বর্ণনা করি। ছবিতে ছবিতে তার রূপের শোভা আঁকি। তাকে বলি সোনার বাঙলা। বলি তার রূপের কোনো তুলনা নেই। বলি কোথাও এতো সুন্দর নদী নেই, কোথাও এমন সবুজ খেত নেই, দিগন্ত নেই। তার রূপের কথা গুণের কথা অনেকটা বাড়িয়ে বলি। মধুর মিথ্যে বলি। আমরা জানি মাকে রূপসী হ'তে হয় না। রূপসী হ'তে হয় অভিনেত্রীকে। আমার মা রূপসী নয়, কিন্তু সে আমার মা। এই তো তার অতুলনীয় রূপ।

কেনো দেশের কথা এতো বলি? কারণ ভয় আছে তাকে হারানোর। মনের গোপন অন্ধকারে একটি ভয় লুকিয়ে আছে আমাদের। দেশকে হয়তো হারিয়ে ফেলতে পারি এ-ভয়ে আমাদের বুক সব সময় কাঁপছে। কারণ দেশকে তো আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম অনেক বার। বিদেশিদের কাছে বারবার আমরা হারিয়েছি আমাদের দেশকে। আমাদের রক্তের মধ্যে তাই বয়ে চলেছে দেশকে হারানোর ভয়। তাই তার কথা এতো বলি। যেদিন ভয় থাকবে না সেদিন এতো বলবো না। যেমন বলে না পশ্চিমের অনেক দেশের মানুষেরা। তারা নিশ্চিত, তাই তাদের ভয় নেই। আমরা অনিশ্চিত, তাই আমাদের কোটি-কোটি বুক ভ'রে দেশকে হারানোর ভয়।

স্বাধীনতার কথা আমাদের খুব বেশি মনে পড়ে। আমাদের বুক আর মুখ স্বাধীনতার স্তবে মুখরিত। আমাদের কবিতা স্বাধীনতার বন্দনায় ছন্দস্পন্দিত। একে নিয়েই আমাদের ভয় সবচেয়ে বেশি। কারণ স্বাধীনতা পাওয়া খুব কঠিন কিন্তু হারানো সহজ। আমরা বারবার হারিয়েছি স্বাধীনতা। আবার মিথ্যে স্বাধীনতাও পেয়েছি একবার। আমাদের পিতারা একবার স্বাধীন হয়েছিলেন, পাকিস্তান বানিয়েছিলেন তাঁরা। পাকিস্তান ছিলো একটি প্রতারণা, ওই স্বাধীনতা ছিলো শঠতা। স্বাধীনতার মুখোশ পরে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিলো পরাধীনতা।

তাইতো একাত্তরের মহাসংগ্রাম। প্রথমবারের মতো আমরা অর্জন করি স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা এখন বিশ বছর বয়স্ক। এখনো তা অটল নয়, শত্রুমুক্ত নয়। তাই তার জন্যে আমাদের এতো ব্যাকুলতা। তাছাড়া আমরা সবাই কিন্তু স্বাধীনতা পাই নি। স্বাধীন বাঙলায় একটি ছোটো গোত্রই স্বাধীন, আর অধিকাংশ মানুষ তাদের অধীন। তারা কখনো বন্দুক দিয়ে

আমাদের ভয় দেখায়। আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকি। আমরা প্রবল হয়ে উঠি, প্রতিবাদ করি, আমাদের রক্তে মাটি ভিজে ওঠে। তবুও আমরা প্রতিবাদ করি। আর তখন তারা পোশাক খুলে বন্দুক ঘরে রেখে আমাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনায়। বলে, দেশ সাধারণ মানুষেরই। তারা বলে, এই গণতন্ত্র দিলাম। যেনো গণতন্ত্র তাদের সম্পত্তি। এজন্যে আমরা স্বাধীন হয়েও সবাই স্বাধীন নই। তাই তো স্বাধীনতার কথা আমাদের এতো বেশি মনে পড়ে।

www.BDeBooks.Com

স্মিতামণি ও তার স্মিত হাসি

পৃথিবীতে আরেকজন মানুষ আসুক এটা আজকাল লোকজন একদম পছন্দ করে না। একটা ছাগল দশটা বাচ্চা দিলে খুশিতে ফেটে পড়ে সবাই। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়। পশুমন্ত্রী বিরাট বৈঠক ডেকে গলা ফুলিয়ে গর্ব করে যে আমাদের পশুসম্পদের খুব উন্নতি হচ্ছে। তাঁর বুক ভ'রে ওঠে সাহসে। তাঁর চাকরিটা আরো অনেকদিন টিকবে ভেবে খুব শান্তি পায় সে। আজকাল সবাই পশুর উন্নতি চায়, মানুষের উন্নতি কেউ চায় না।

এক বিঘে জমিতে যদি আধমণ ধান বেশি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। সারাদেশে তখন উৎসব লেগে যায়। গান উঠতে থাকে বাদ্য বাজতে থাকে। নাচ শুরু হয় মাঠে ঘাটে। 'আধমণ ধান বেশি হয়েছে, আধমণ ধান বেশি হয়েছে' বলে সব কাজ ফেলে কৃষি সচিব ছোটে রাজার প্রাসাদে। রাজাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সচিব শুভ সংবাদটি দেয় : আধমণ ধান বেশি হয়েছে এক বিঘে জমিতে। শুনে সুখে ঝলমল ক'রে ওঠে রাজার মুখ। আর রাজা ভাবে, আহ্, প্রতিদিন যদি এতো সুন্দর সংবাদ শুনে আমার ঘুম ভাঙতো!

সবার আগমনের সংবাদই শুভ। শুধু একজন মানুষ আসবে বা এসে গেছে, শুধু এমন সংবাদ শুনতেই ভয় পায় লোকজন। তাই চারদিকে মানুষের বিরুদ্ধে ফিসফিস ফিসফাস। মানুষকে আটকাতে হবে, মানুষকে আটকাতে হবে। মানুষের হাসি যতোই সুন্দর হোক, শিশুর গাল যতোই লাল হোক, তাকে আটকাতে হবে। তাকে আসতে দেয়া যাবে না। বড়ো বেশি বোঝাই হয়ে গেছে পৃথিবী-নৌকোটি, নতুন কারো জন্যে জায়গা নেই। তার পাটাতনে মানুষ, ছইয়ে মানুষ, গলুইয়ে মানুষ। ভীষণ ভরে গেছে নৌকোটি। আরেকটি শিশু পা দিলেই নৌকোটি ডুবে যাবে গভীর পানিতে। তাই সবাই সাবধান, যেনো আর কেউ এ-নৌকোয় উঠতে না পারে।

সবাই আসুক, শুধু মানুষ আসবে না। কিন্তু যে-মানুষ ঠিক করেছে আসবে, তাকে কে আটকাতে পারে? আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে যে, তাকে রোধ করা কার সাধ্য?

সেও ঠিক করেছে আসবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর অন্ধকারকে তার হাসির আলোকে আলোকিত ক'রে তুলবে। কিন্তু বসে কি থাকতে পারে পৃথিবীর

কর্মীরা? তারা কি মিলেমিশে তৈরি ক'রে তুলবে না একটা গোলমাল? যাতে সে একটু বিপদে পড়ে। ঠিক তাই হলো। রাজারা আর প্রজারা মিলে বছরের আগস্ট মাসের সাতাশ তারিখে বেশ একটা গোলমাল বাধিয়ে তুললো। প্রজারা পছন্দ করে না রাজাদের, তাই গোলমাল। হরতাল। বন্ধ সব কিছু। দোকান বন্ধ, রাস্তায় রিকশে নেই, হাসপাতাল বন্ধ। হরতাল, রাজার বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার মনে হলো, তার বিরুদ্ধে। যে আসবে তার বিরুদ্ধে। আসবে মানুষ, আসবে আলো, আসবে সোনার ঝিলিকের চেয়েও সোনালি যার হাসি। হরতাল তার বিরুদ্ধে। মানুষের বিরুদ্ধে। পৃথিবীতে আজকাল মানুষের বিরুদ্ধে সবাই।

তখনো তার কোনো নাম ছিলো না। পরে তার হয় অনেক নাম। স্মিতা। স্মিতামণি। তাকে আমি কখনো ডাকি : সে। কখনো ডাকি : তিনি। কখনো সে : আপনি। কখনো সে : তুমি। কিন্তু কখনো তাকে কেউ 'তুই' বলে না। সে তো আলোর টুকরো, তাই দিনে নয়, জ্বলে উঠলো সন্ধ্যের পরে। পিজি হাসপাতালের অন্ধকার দূর ক'রে, অষুধের গন্ধকে গোলাপের ঘ্রাণে বদলে দিয়ে সে এলো। জন্ম হলো আনন্দের।

আমি গিয়ে দেখি ডাক্তার তাকে শুইয়ে রেখেছে একটা বড়ো প্লেটের ওপর। পানিতে ভিজিয়ে। দেখেই আমার ভয় ধরে গেলো। যদি অসুখ ক'রে? আমি দৌড়ে তার দিকে ছুটলাম। কিন্তু বাব্বা, কি কড়া ডাক্তারনী। আমাকে কিছুতেই কাছে যেতে দেবে না। মানুষ থেকে মানুষকে খুব দূরে রাখতে হবে। মানুষের কাছে মানুষ গেলেই নাকি অসুখ হয় মানুষের। তাই আমি দূর থেকেই দেখলাম তাকে।

পর দিন ভোরে হাসপাতালে গিয়ে দেখি বিছানায় ফুটে আছে একটি গোলাপি ফুল। তার মাথা ভরা কালো চুল। আমরা তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। আর অমনি সে চোখ মেললো। ও দুটো কি চোখ? মনে হলো পাপড়ি মেলে তার মুখের দু-পাশে ফুটলো দুটি ছোট্ট ফুল। বাগানেও এতো সুন্দর ফুল নেই কোথাও।

অনেক আগে আমি পড়েছিলাম শিশু নাকি নরম মাটির মতো। কুমোর যেমন নরম মাটি ছেনে ইচ্ছে মতো বানায় নানান রকম পুতুল, তেমনি শিশু নামক নরম মাটিকে ইচ্ছে মতো ছেনে ইচ্ছে মতো বানানো যায়। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। শিশু মানুষ, ছোট্ট মানুষ। সে তার মতো বেড়ে ওঠে, তার মতো বড়ো হয়। তার মতো মানুষ হয়। হয়ে ওঠে ব্যক্তি। ছোটোকালেই সে একজন ব্যক্তি, ছোটোকালেই সে একজন ব্যক্তিত্ব।

www.BDeBooks.Com

তার নাম রাখলাম স্মিতা। সে আমাদের স্মিতামণি। সে আমাদের স্মিত হাসি। তার হাসির মতো জ্যোৎস্না নেই। তার কণ্ঠস্বরের মতো কোনো গান নেই।

সে যে ব্যক্তি হয়ে উঠছে বুঝলাম কয়েক দিন পরেই।

ঘুমোবে সে আমার আর তার মায়ের মাঝখানে। ছোটো মানুষ, কিন্তু বিশাল তার ব্যক্তিত্ব। ছোট্ট একটি পা সে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো আমার ওপর। এতোটুকু পা কি অতো উঁচুতে উঠবে? না, সে তো ছোটো পা দিয়ে নাগাল পায় না অতোখানি। তার পা উঠোনো দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। এ যেনো এক পদক্ষেপে হিমালয়ের চূড়োয় ওঠা। কেউ কি এক পা মাটিতে রেখে আরেক পা রাখতে পারে এভারেস্টে? কেউ পারে না। কিন্তু মানুষ পারে।

মানুষের পদক্ষেপ লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ। মহাজগতের সমান দীর্ঘ।

কয়েক দিন পর দেখি সে বিছানায় ঘুমের মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। উত্তরে মাথা দিয়ে শোয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মাথা চ'লে যায় দক্ষিণে, বা পুবে, বা পশ্চিমে। ঘুমের মধ্যে যেনো মহাজগত জুড়ে বেড়িয়ে চলেছে সে। মাঝে মাঝে হেসে ওঠে, আবার ঠোঁট কাঁপতে থাকে কখনো নতুন পাতার মতো। ডুকরে কেঁদে ওঠে কখনো।

আর ঘুম ভাঙলেই সেই মিলিয়ন ডলার হাসি। সেই ভাগ্যবান যার দিকে মুখ রেখে তার ঘুম ভাঙে। কখন ঘুম ভাঙবে, কখন ঘুম ভাঙবে, এ-আশায় আমরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঘুম ভাঙলেই আমাদের প্রত্যেকের ভাগে মিলিয়ন ডলার। ঘরে এতো টাকা জমে যায় যে রাখার জায়গা হয় না।

সে কথা বলে না। তিনি কথা বলেন না। কেননা সে জানে, কেননা তিনি জানেন কথা রুপোর মতো দামি। আর নীরবতা দামি অনেক সোনার চেয়েও। তার কথা না বলাই বেশি অর্থময়। আমরা সারাদিন তার নিঃশব্দ কথা শুনি।

কয়েক মাসে লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রম করে সে। মানুষের বিকাশ ঘটতে লেগে ছিলো কোটি কোটি বছর। সেই সমুদ্রের লোনা পানি থেকে উঠে এসে কতো রূপ আর অপরূপের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে মানুষ। মানুষের বিকাশের কোটি বছর অনায়াসে পেরিয়ে আসে আমাদের স্মিতামণি। পৃথিবীর সমস্ত স্মিতামণি।

একদিন দেখি চিনতে শিখেছে সে। একদিন দেখি বুঝতে শিখেছে সে। কি ক'রে চিনলো? কি ক'রে বুঝলো? কেউ তো তাকে চিনিয়ে দেয় নি।

কেউ তো তাকে বুঝিয়ে দেয় নি। সে নিয়ে এসেছে সেই প্রতিভা, যা শুধু একমাত্র মানুষেরই অধিকারে। সে মানুষ। সে প্রতিভাবান। সূর্য তার সন্তান।

মা কাকে বলে, তা সে জানে না। জানে না কাকে বলে বাবা। জানে না কে আপা, আর কে দাদু, আর কে কাকু। কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে কে তার কী। বাবার কলিংবেল বাজানোর শব্দ চিনতে পারে সে। বিছানায় ঝলমল ক'রে ওঠে, দরোজার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, গে, গে, গে। মায়ের শাড়ির আঁচল দেখলেই ঝলমল ঝলমল ক'রে ওঠে সে। কেউ তাকে কিছু শিখিয়ে দেয় নি। কোনো ইস্কুলে পড়ে নি সে। তবুও সে শিখেছে অনেক কিছু, যা শিখতে মানুষের লেগেছে কোটি বছর।

খুব ভালো লাগে তার বাইরে যেতে। কেউ জামা পরলেই বুঝতে পারে সে বাইরে যাওয়ার সময় হয়েছে তার। আর যখন তাকে খুব নতুন জামা পরানো হয়, সে বুঝতে পারে তাকেও নিয়ে যাওয়া হবে বেড়াতে। তখন খুশিতে ঝকঝক করে স্মিতামণি। ভালো লাগে তার পার্কে যেতে। গাছের ছায়ায় হামাগুড়ি দিতে এতো ভালো লাগে তার।

অনেক কিছু শিখে গেছে সে। অনেক বয়স হয়েছে তার।

দীর্ঘ দশমাস তার বয়স।

মুখ থেকে তার বেরোতে শুরু করেছে নানান রকম শব্দ। তার সব কথা কয়েকটি অবাঙলা শব্দে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে।

আর সে মুখোমুখি হয়েছে এক বিশাল পরীক্ষার।

তাকে উত্তীর্ণ হ'তে হবে সেই পরীক্ষা।

ওই পরীক্ষাটি মানব জাতির সামনে ছিলো একটি অসাধারণ পরীক্ষা।

সে দাঁড়াতে চায়। হামাগুড়ি দিচ্ছে সে অনেক দিন ধ'রে। এখন সে দাঁড়াতে চায়। দাঁড়ানো ব্যাপারটি তো আর সোজা নয়। প্রতিটি মানুষের মাথার ওপর হাজার হাজার মণ ভার। মহাজগতের ভার। তার মাথার ওপরও। সেই ভার ঠেলে দাঁড়াবে সে। মাথা তুলবে। মাথা তোলা খুব সহজ নয়। মাথা নত ক'রে রাখাই সহজ। সে হাঁটতে চায়, চায় মাথা তুলতে। চায় হাঁটতে। হাঁটা? সে আরেক পরীক্ষা মানুষের।

তার দাঁড়ানোর সময় মনে প'ড়ে যায় তার আপা মৌলির দাঁড়ানোর ঘটনাটি। দাঁড়ানোর ব্যাপারটিকে মৌলি অনেকটা পরীক্ষা হিশেবেই নিয়েছিলো। সে যেনো বুঝে গিয়েছিলো তাকে দাঁড়াতে হবে সব ভার ঠেলে। তাই একদিন দুপুরে বারবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলো মৌলি। আমরা তাকিয়ে দেখছিলাম তার পরাজয়-না-মানা প্রচেষ্টা।

www.BDeBooks.Com

হঠাৎ দাঁড়াতে চেয়েই মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো মৌলি। ব্যথাও পেয়েছিলো একটু। কিন্তু তাতে সে কাঁদে নি। বরং পরের মুহূর্তেই চেষ্টা করে আবার দাঁড়াতে এবং আবার প'ড়ে যায়। কে যেনো তাকে ফেলে দিচ্ছে, বলছে তোমাকে দাঁড়াতে দেবো না। তার সাথে যুদ্ধ মৌলির। বেশ কয়েকবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, এবং প'ড়ে গেলো। আমরা তাকিয়ে আছি তার দিকে। কিন্তু সে কিছুই দেখছে না, ভাবছে না; ভাবছে শুধু, দাঁড়াতে হবে তাকে।

একটু ঘামও জমেছে তার শরীরে। নাকে, মুখে। বেশ কয়েকবার পড়ে যাওয়ার পর অবশেষে সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো। এটা এক বিরাট জয়। মৌলির। তখন সারা পৃথিবীর উচিত ছিলো তার জয়ে উল্লসিত হয়ে হাততালি দেয়া। কিন্তু কেউ হাততালি দেয় নি। আমরাও দিই নি। তাই দাঁড়িয়েই মৌলি নিজে নিজের বিজয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে। আর হাততালি দিয়ে উঠি আমরা। মানুষের জয়ে হাততালি না দিয়ে কি পারা যায়?

একইভাবে দাঁড়াতে শেখে স্মিতামণি। তবে অতো বেশি পড়ে নি, নিজে হাততালিও দেয় নি। কয়েকদিনের মধ্যেই টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করে মেঝেতে, মেঝে পেরিয়ে যায়। উঁকি দেয় বারান্দায়। দরোজা ঠেলে খুলে ফেলে। আর সামনে শাদা বেড়ালটি দেখলেই পিঁড়িতে বসার মতো ব'সে ডাকে, গ্যাঁ, গ্যাঁ, গ্যাঁ।

এখন সে একবছরের এক মহিলা।

দায়িত্বও তার অনেক।

বিছানা থেকে নেমেই হেঁটে রওনা হয় আলনার দিকে। কাপড়গুলো যে গুছিয়েছে, সে কিচ্ছু পারে না। একদম ভালো হয় নি। তাই টেনে টেনে আলনা থেকে নামিয়ে ফেলে সব কাপড়।

টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়লেই হাঁটতে থাকে সেদিকে। রিসিভারটি কাঁধে নিয়ে বলতে থাকে, গ্যাঁ, হু, হা, বা, কা। একবার এ-কাঁধে ঝুলোয় আরেকবার অন্য কাঁধে।

মায়ের ব্যাগটা খুব প্রিয় তার। ওটা পেলেই খুলে ফেলে। লিপস্টিক বের ক'রে ঠোঁট আর মুখ ভরে ঘষে।

চিরুনি এনে মাথায় বুলোয়। বুলিয়ে দেয় অন্যদের মাথায়।

পত্রিকা নিয়ে দু-হাতে ধরে বলতে থাকে, গ্যাঁ, গ্যাঁ, বা, কা, মা।

ছবি দেখলেই চুমো খায়।

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে পাভলোভার চেয়েও সুন্দর ভঙ্গিতে।

ঘুমোনোর আগে তার চোখ ঘোলা হয়ে আসে বেতুল ফলের মাংসের মতো। একটু ভালোভাবে তাকালে ওই চোখে ঘুম দেখা যায়। ঘুমের রঙ কি, তার চেহারা কেমন, কতোখানি লম্বা ঘুমের চুল, সব দেখা যায় তার চোখের ভেতরে তাকালে। সে এখন লুকোচুরি খেলতে পারে। প্লাস্টিকের চেয়ারের এদিকে আমি আর ওদিকে সে। সারা দুপুর লুকোচুরি খেলি। দৌড় দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায়। গতির জন্যে নয়, সৌন্দর্যের জন্যে তার ওই ছুটে যাওয়া অতুলনীয় ঘটনা। সে এখন প্রস্তুত। সে মানুষ। সভ্যতাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে মানুষকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে সে এখন তৈরি।

একদিন আমি ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দেখি বৃষ্টির মধ্যে তারই বয়সের একটি মেয়ে কাঁথা জড়িয়ে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। দেখে আমি আঁৎকে উঠি।

একটি ছবিতে দেখেছিলাম তারই বয়সের একটি মেয়ের গাল আর চোখ ঝলসে গেছে বোমার আগুনে।

পৃথিবীতে কোটিকোটি স্মিতামণি বৃষ্টির মধ্যে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে ঘুমোয়। পেটে ভাত নেই।

পৃথিবীতে কোটিকোটি স্মিতামণির গাল আর চোখ ঝলসে গেছে বোমার আগুনে।

দেশেদেশে মানুষ জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দর স্মিতামণিদের বৃষ্টির মধ্যে বাইরে ফেলে রাখার চেষ্টা করছে।

দেশেদেশে মানুষ চেষ্টা করছে নতুন নতুন বোমা বানাতে যাতে স্মিতামণিদের গাল আর চোখ খুব ভয়ঙ্করভাবে ঝলসে দিতে পারে তারা।

আমি স্মিতামণিদের জন্যে সুন্দর পৃথিবী চাই। যেখানে বোমা নেই। যেখানে ভাত আছে। যেখানে ঘর আছে। অমন পৃথিবী চাই। আর ওই পৃথিবীতে চাঁদের মতো আলো ঢেলে আসবে স্মিতামণিরা। মানুষ হচ্ছে অপার সম্ভাবনা। অস্ত্র কোনো সম্ভাবনা নয়। বোমা কোনো সম্ভাবনা নয়। পৃথিবীতে একমাত্র সম্ভাবনা হচ্ছে মানুষ। আমি দেখি স্মিতামণিরা আজ, আগামীকাল, পরশু, হাজার বছর পর, কোটি বছর পর বিকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে সে-সম্ভাবনার।

www.BDeBooks.Com

কবিতা

কখনো আমি
শুভেচ্ছা
ধুয়ে দিলো মৌলির জামাটা
ফাগুন মাস
দোকানি
ইঁদুরের লেজ
স্বপ্নের ভুবনে

কখনো আমি

কখনো আমি স্বপ্ন দেখি যদি
স্বপ্ন দেখবো একটি বিশাল নদী।
নদীর ওপর আকাশ ঘন নীল
নীলের ভেতর উড়ছে গাঙচিল।
আকাশ ছুঁয়ে উঠছে কেবল ঢেউ
আমি ছাড়া চারদিকে নেই কেউ।

কখনো আমি কাউকে যদি ডাকি
ডাকবো একটি কোমল সুদূর পাখি।
পাখির ডানায় আঁকা বনের ছবি
চোখের তারায় জ্বলে ভোরের রবি।
আকাশ কাঁপে পাখির গলার সুরে
বৃষ্টি নামে সব পৃথিবী জুড়ে।

www.BDeBooks.Com

শুভেচ্ছা

স্মিতাকে

ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেঘ, মিটিমিটি তারা
ভালো থেকো পাখি, সবুজ পাতারা
ভালো থেকো চর, ছোটো কুঁড়েঘর, ভালো থেকো।
ভালো থেকো চিল, আকাশের নীল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো পাতা, নিশির শিশির
ভালো থেকো জল, নদীটির তীর
ভালো থেকো গাছ, পুকুরের মাছ, ভালো থেকো।
ভালো থেকো কাক, ডাহুকের ডাক, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মাঠ, রাখালের বাঁশি
ভালো থেকো লাউ, কুমড়োর হাসি
ভালো থেকো আম, ছায়াঢাকা গ্রাম, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ঘাস, ভোরের বাতাস, ভালো থেকো।
ভালো থেকো রোদ, মাঘের কোকিল
ভালো থেকো বক, আড়িয়ল বিল
ভালো থেকো নাও, মধুমাখা গাঁও, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেলা, লাল ছেলেবেলা, ভালো থেকো।
ভালো থেকো, ভালো থেকো, ভালো থেকো।

স্বপ্ন

অনন্যকে

যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকি অথবা পাখির ছবি আঁকি
কিম্বা বই পড়ি,
যখন বনে বেড়াতে যাই গোশলখানায় কবিতা গাই
অথবা কাজ করি,
যখন আকাশ মেঘে ভরে আমার মন কেমন করে
একলা ব'সে লেখি,
চারদিকে সোনার মতো ছড়িয়ে থাকা ইতস্তত
কেবল স্বপ্ন দেখি।
ওই যে মানুষ নৌকাগুলো পথের ওপর রঙিন ধুলো
ফুলের শোভা গাছে,
বিশাল একটা চাঁদের তলে ধানের পাতায় শিশির জ্বলে
নর্তকীরা নাচে।
যেনো তাদের ডাকছে কেউ তাই তো আসে শ্যামল ঢেউ
দুলে পুকুর পাড়ে,
আমার স্বপ্ন গোলাপ ডালে সকাল দুপুর সন্ধ্যাকালে
দীর্ঘ গ্রীবা নাড়ে!
আমার স্বপ্ন বাসে ওঠে ট্রাকের চাকার সঙ্গে ছোটে
বিমান হয়ে ওড়ে,
আমার স্বপ্ন ফেরিঅলা উচ্চস্বরে ফুলিয়ে গলা
শহর ভ'রে ঘোরে।
আমার স্বপ্নের হাজার গন্ধ একশো একুশ রকম ছন্দ
পাঁচশো পঁচিশ রং,
আমার স্বপ্ন গ্রামের মাঝে রাত দুপুরে হঠাৎ বাজে
ডিং ডং ডিং ডং।
অন্য সবাই ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্ন দ্যাখে ঘুমের ঘোরে
মাথা রেখে মেঘে,
কেবল আমি একলা আমি সকাল সন্ধ্যা দিবসযামি
স্বপ্ন দেখি জেগে।
আমি শুধুই ভয়ে মরি যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি
স্বপ্নদের কী হবে,
যদি কোনো দস্যু এসে ভাঙে আমার স্বপ্নকে সে
বাঁচবো কেমনে তবে?
এ-পৃথিবী এতো মধুর তার গলাতে এতো যে সুর
শুনি এ-বুক ভরি,
তাই তো আমি রাত্রি ও দিন জেগে থেকে নিদ্রাবিহীন
স্বপ্ন রক্ষা করি।

www.BDeBooks.Com

ধুয়ে দিলো মৌলির জামাটা

আষাঢ় মাসের সেদিন ছিলো রোববার ও মাস পয়লা
তাকিয়ে দেখি দূরের আকাশ ভীষণ রকম ময়লা।
পুব দিকটা মেঘলা রঙের বুকের পাশটা কালচে
পায়ের দিকটা কুঁচকে গেছে একটুকু নয় লালচে।
ধুলোর তলে হারিয়ে গেছে চোখের মতোন নীলটা
দেখাই যায় না টিপের মতো টুকটুকে লাল তিলটা।

আকাশ নয় ওটা মৌলির জামা তৈরি নরম সিল্‌কে
দিনভর মৌলি পরেছে বলেই দেখাই যায় না নীলকে!
নীল জামাটা ময়লা এখন এতো মৌলির দোষ না
হঠাৎ আকাশে একটা সাবান উঠলো ছড়িয়ে জোস্‌না।
আকাশে সাবান ধবধবে গোল দুধের মতোন মিষ্টি
নামলো ঝরঝর নরম নরম রুপোর রঙের বিষ্টি।
চাঁদের সাবান মেখে মেখে ফরশা রুপোর পানিতে
মৌলির জামা ধুয়ে দিলো সাতটি পরীর রানিতে!

ভোর আসতেই দেখলো সবাই ঝিল মিল ঝিল বাতাসে
নীল জামাটা আকাশ ভ'রে উড়ছে বিরাট আকাশে।
সিলকে তৈরি নীলকে জামা কেমন মিষ্টি নীলটা
পুবের দিকে উঠছে হেসে টুকটুকে লাল তিলটা!

ফাগুন মাস

মৌলিকে

ফাগুনটা খুব ভীষণ দস্যি মাস
পাথর ঠেলে মাথা উঁচোয় ঘাস।
হাড়ের মতো শক্ত ডাল ফেঁড়ে
সবুজ পাতা আবার ওঠে বেড়ে।
সকল দিকে বনের বিশাল গাল
ঝিলিক দিয়ে প্রত্যহ হয় লাল।
বাঙলাদেশের মাঠে বনের তলে
ফাগুন মাসে সবুজ আগুন জ্বলে।

ফাগুনটা খুব ভীষণ দুঃখী মাস
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস
ফাগুন মাসে গোলাপ কাঁদে বনে
কান্নারা সব ডুকরে ওঠে মনে।
ফাগুন মাসে মায়ের চোখে জল
ঘাসের ওপর কাঁপে যে টলমল।
ফাগুন মাসে বোনেরা ওঠে কেঁদে
হারানো ভাই দুই বাহুতে বেঁধে।
ফাগুন মাসে ভাইয়েরা নামে পথে
ফাগুন মাসে দস্যু আসে রথে।
ফাগুন মাসে বুকের ক্রোধ ঢেলে
ফাগুন তার আগুন দেয় জ্বেলে।
বাঙলাদেশের শহর গ্রামে চরে
ফাগুন মাসে রক্ত ঝরে পড়ে।
ফাগুন মাসে দুঃখী গোলাপ ফোটে
বুকের ভেতর শহীদ মিনার ওঠে।

সেই যে কবে কয়েকজন খোকা
ফুল ফোটালো-রক্ত থোকা থোকা-
গাছের ডালে পথের বুকে ঘরে
ফাগুন মাসে তাদেরই মনে পড়ে।
সেই যে কবে-তিরিশ বছর হলো–
ফাগুন মাসের দু-চোখ ছলোছলো।
বুকের ভেতর ফাগুন পোষে ভয়–
তার খোকাদের আবার কী যে হয়!

www.BDeBooks.Com

দোকানি

মৌলির জন্যে

দু-দিন ধ'রে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান,
জাল ছড়িয়ে আস্তে ধরছি
তারার ডানার মিষ্টি কালো
ঝকঝকে সব রোদের ঘ্রাণ।
বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ,
একশো টাকায় এক রত্তি
বিক্রি করছি সত্যি সত্যি
সবুজ রঙের নরম ধূপ।
চাঁদে চড়ে ভর নিশিতে
জ্যোৎস্না ভ'রে ছোটো শিশিতে
বানাই ঠাণ্ডা আইসকিরিম,
টোস্টে একটু রৌদ্র মেখে
বিক্রি করছি টাটকা দেখে
মেঘ-রৌদ্রের সিদ্ধ ডিম।
বিক্রি করছি সন্ধ্যা রাত্রে
চকচকে এক রুপোর পাত্রে
জ্যোৎস্না-ডাবের মিষ্টি জল,
সবার যাতে সময় কাটে
ছুঁড়ে দিয়েছি আকাশ-মাঠে
একটি শাদা রবারবল।
বিক্রি করছি রাশি রাশি
লাল গালের মিষ্টি হাসি
পরীর গায়ের সিল্কশাড়ি,
জোনাকিদের দেহের মতো
করছি বিক্রি শতো শতো
ইস্টিমার ও ঘরবাড়ি।
ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি
হচ্ছে এখন ভীষণ বিক্রি
নীল ময়ূরের লাল ছবি,
শিশির-ভেজা মিনার থেকে
এসব ছবি দিচ্ছে এঁকে
ডানাঅলা এক কবি।

ইঁদুরের লেজ

বিলেত থেকে একটি ইঁদুর ঠোঁটে মাখা মিষ্টি সিঁদুর, বললো এসে
মুচকি হেসে চুলের ফাঁকে আস্তে কেশে,
আমাকে কি চিনতে পারো?
চিনতে আমি পারি তারে, দেখে-
ছিলাম লেকের পারে : মুখখানা তার
শুক্রবারে, পা-দুখানা রোববারে।
ইঁদুর সে খুব রূপবতী গায়ের চামড়া
দুধেল অতি, হাসলে ঠিক সোনার
মতো জ্যোৎস্না বেরোয় শতোশতো
জানি আমি জানি নিজে, পাশ
করেছে ক্যামব্রিজে একটা ভীষণ
পরীক্ষাতে শনিবার সন্ধ্যা-
রাতে। বলি আমি তারে ডেকে,
এসেছো তুমি বিলেত থেকে কী
কারণে? ঝিলিক দিয়ে রঙিন
অতি হাসলো একটু রূপবতী,
বললো, আমি আ-শি-আ-ছি
বাংলাড্যাশে অ-পা-রে-শ-নে!
লেজটি যদি ছাঁটতে পারি
তা হলে তো সারিসারি
জুটবে রাজা। এসেছি
তাই বাংলাদেশে।
চমক শেষে চক্ষু
মেলে দেখি
আমি, রূপ-
বতী গেছে
আমার
সামনে
তার
লেজটি
ফে
লে।

www.BDeBooks.Com

স্বপ্নের ভুবনে

ফিরে এসো, সোনার খোকন, সারাক্ষণ চুপিচুপি ডাকে
স্বপ্নের ভেতর থেকে লাল গাঢ় স্বরে কে যেনো আমাকে।
তার ডাকে আমার ভেতরে বাজে টুংটাং হীরের গিটার,
মন ঢেকে দেয় মায়াবি রঙের পাখি ডানা দিয়ে তার।

কে তুমি আমাকে ডাকো, রাশিরাশি কাজের ভেতরে,
কোথা থেকে এসে ডাকো সোনাঝরা লাল নীল স্বরে?
তোমার পালক ঢাকে আমার শরীর, আঁকাবাঁকা চুল,
রামধনু উড়ে এসে ছুঁড়ে দেয় একা একশো পুতুল।
আমি তারে ডেকে বলি, কে তুমি ডাকছো হয়ে এতো লাল?
মৃদু স্বরে বললো সে, আমি, আমি তো তোমার বাল্যকাল।

সেই স্বরে আমার ঘরের জানালারা হয়ে গেলো গাছ,
ঘরটাকে নদী ভেবে বইগুলো সব হয়ে গেলো মাছ,
দেয়ালের ঘড়িটায় ডেকে ওঠে দশটি কোমল কোকিল,
আয়নায় দুলে ওঠে পদ্মফুল, শাদা আড়িয়ল বিল।
পাখি সব করে রব, খড়কুটো মাঠ গেয়ে ওঠে গান
খেলাঘরে খেলা করে লাল ছেলেবেলা, স্বপ্নের সমান।
ডেকে আমি বলি, আমাকে ভোলো নি তুমি, সোনারঙ পাখি?
কবুতর গায় : তা যে সহজ নয়, তুমি জানো না কি?
আমি বলি, তোমরা কেমন আছো, বলো তোমরা সবাই?
নেচে ওঠে ইলশে মাছ : ভালো আছি, তাই আজ তোমাকেই চাই।

রুপোলি শিশির হয়ে গলে যেতে চায় চারতলা বাড়ি
আমাদের, কানামাছি ভোঁভোঁ চলে নিচ ঘরে, ছাদে আড়ি
পাতে কোমল কুয়াশা, বুকে জোনাকিরা জ্বলে আর নেবে
তারা যেনো আজ রাতে সারাদেশে আলো জ্বেলে দেবে।
তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমরা, গান গায় চিল,
আমার সোনালি ডানা, দ্যাখো, ঢালে রঙের মিছিল,
বেহালা শোনাবো আজ, স্বপ্নের মতো রূপকথা

শোনাবে তোমাকে যাদের এসেছো ফেলে, সেই পাতালতা,
আবার হিজল ফুল লাল হবে, যদি তুমি আসো ফিরে
আজ গান হবে নদীর সজল তীরে, নিশির শিশিরে।
আমাকে ডাকলো এসে আমারই বাল্যকাল, আজ রাতে
যখন কোমল হয়ে গলা বাড়িয়েছে চাঁদ এ-ঢাকাতে
একটি শিশুর জন্যে, আমাকে দেখেই দিলো হাতছানি
সবচে রূপসী যিনি, সেই আলোঢালা আকাশের রানী।
তখন শহর ভরে লোকগুলো রাজপথে, হাটে, বাটে,
ভীষণ খুশিতে ফুল ছিঁড়ে, ডাল ভাঙে, আর গাছ কাটে।
নীরব ব্যথায় কাঁদে গাছ, চিৎকার ক'রে ওঠে রাত,
গাছের শরীর ফাঁড়ে মানুষের হিংস্র ধারালো করাত।

চলো আমি যাবো, তোমাদের সাথে, বলি কেঁদে কেঁদে আমি।
একটি সোনালি চিল বকুল মালার মতো এলো নামি
আমার গলায়। বললো সে, মনে তুমি রেখো নাকো ভয়,
তোমাকে উড়িয়ে নেবো আমার ডানায়। আকাশকে জয়
করে বেঁচে আছি আমি। চিলের ডানায় আমি ও আকাশ,
আমাদের সাথী হয় গাঢ় নীল আর কোমল বাতাস।

আবার ফিরেছি আমি বাল্যকালে, প্রিয় বন্ধুরা সবাই
আসে, নাচে, গান গায়, ছড়া কাটে, দোলে তাই-তাই।
আমি ইলশে মাছ।
আমি মাছরাঙা।
বাকুমবাকুম আমি কবুতর।
তোমার খেলার মাঠ আমি।
আমি তোর আনন্দের স্বর।
আমি ঘুড়ি লাল রঙ।
আমি মারবেল।
আমি তোর মোহন লাটাই।
তুই নেই, একা প'ড়ে আছি, কী যে কষ্টে সময় কাটাই।

আমার বন্ধুরা ছুটে আসে, তুলে নেয় সকলের কাঁধে,
আমার শৈশব নদীর জলের মতো বইছে অবাধে।

www.BDeBooks.Com

দলেদলে আসে, চারদিকে জমে ওঠে লাল নীল ছবি,
গুনগুন গান গেয়ে যে এলো, সে আমার আদি মহাকবি
জীবনের। গাইলো সে বাজিয়ে একতারা,
শোনো ভাই আছো যারা আমি আজ আত্মহারা
নদীর মতোন,
অনেক রজনী জেগে পাখিদের বর মেগে
করেছি সৃজন
একটি মায়াবী গাথা মায়ের নকশী কাঁথা
অতি অপরূপ,
বাঁশির সুরের সাথে জ্বেলে দাও এই রাতে
সোনারঙ ধুপ।
ফুটুক গানের ফুল সকল গাছের মূল
জ্বেলে দিক সুর,
জোনাকিরা গাছেগাছে ফুল হয়ে ফুটে আছে
ভীষণ মধুর।
তোমাকে অনেক দিন দেখি নি তো, চোখহীন
হয়ে আছি তাই,
তুমি এলে বাঁশি বাজে বনের মনের মাঝে
বেহালা সানাই।

আমার শৈশব বাজে বাঁশবনে, নদীর কিনারে,
ঢেউয়ের বেহালায়, কাশফুল, মেঘের মিনারে,
পুকুরের শাদা আয়নায়, দুধশাদা পদ্মের ডাঁটায়,
আকাশের নীল নদে তারাদের জোয়ারভাটায়,
হিজলের লাল ফুলে, ডাহুকের কাঁদোকাঁদো ডাকে,
মাছের পিছল পিঠে ভেসে ছেলেবেলা ডাকছে আমাকে।
বান্ধব ইলিশ এসে ধরে হাত, আর আমরা দুজন
দাঁড় বেয়ে চলে যাই যেথা আছে নীল স্বপ্নের ভুবন,
পদ্মার ঢেউয়ের তলে রুপোর দাগের মতো সারিসারি
থাম দিয়ে ছবি এঁকে কারা যেনো বানিয়েছে বাড়ি।
একটি বাড়িতে দেখি দুটি হাঁস ছড়া কাটে আগডুম বাগডুম
ছাদের ওপরে শুনি শাদাশাদা নীল নীল বাকুম বাকুম।
বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি রিং ধরে দোলে এক জোড়া মাছ,
হাততালি দিয়ে হরিণের পিঠে তারা দেখায় সার্কাস।

ভেসে উঠি জল থেকে, খেজুরের ডালে তিনটি বাবুই
চোখের মতোন বাসা গড়ে ঠোঁটে নিয়ে সুতোসুই।

হঠাৎ দেখি উড়ছে তারা রোদের মধ্যে ধুলোর মতো,
চাঁদের থেকে নামছে পরী নূপুর বাজে শতোশতো,
মেঘের মতো আসছে ছুটে কাশের শাদা ফুলের মালা,
মাঝ নদীতে লাফিয়ে ওঠে একটি বিরাট রঙের থালা,
আকাশ ফুঁড়ে বাড়তে থাকে বলের মতো তালের মাথা,
জোৎস্নাবুড়ি বিছিয়ে দিলো আকাশ জুড়ে নকশী কাঁথা।

খোকন তোমার কেমন লাগছে, আমাকে শুধায় পাখি,
দেখছি যেনো ছায়াছবি, আমি উঠি তারই মতো ডাকি।
ধীরে কাছে এসে সে কেমন চোখ মেলে নীরবে তাকায়,
জানতে চায়, ফিরে যেতে চাও আর ওই হিংসুকে ঢাকায়?
যেখানে কেবল মানুষেরা গাছ কাটে, ছিঁড়ে ফেলে ফুল,
মল্লিকা হাসনা নেই, চম্পা নেই, নেই বেল ও শিমুল?
সেখানে শিশুরা পাখির মধুর ডাক রেডিয়োতে শোনে
আর কল্পনার হাজার রকম জাল সারাদিন বোনে।

ধানের সোনালি ছড়া কথা বলে যেনো স্বপ্নের কূজন,
দেখা নেই কতোদিন, এতো দূরে আছি আমরা দুজন।
আমার জবাব নেই, বলি শুধু নিজ মনেমনে,
তোমাকে দেখেছি আমি একদিন টেলিভিশনে।
ফিরে আসি আবার ঢাকায়, দেখি সকল জানলায়
দুলছে দোয়েল পাখি, বাবুই বুনছে বাসা কাঠের আলনায়,
আয়নাটি জুড়ে আছে নদীর কোমল জল, দেয়ালঘড়িতে
বারোটি কোকিল মুখর করছে বাড়ি কুহুকুহু গীতে,
মেঝেটা আকাশ হয়ে গেছে, ছাদটা হয়ে গেছে চাঁদ,
সারা বাড়ি থেকে ওঠে মিষ্টি গন্ধ, কমলার স্বাদ।
ছড়ার বইয়ের চোখে নেমে আসে নীলরঙ ঘুম,
চেয়ে দেখি হাতঘড়ি পাপড়ি মেলে সুনীল কুসুম।

প্রতিদিন সকলকে ফাঁকি দিয়ে আমি মনে মনে
গোপনে হারিয়ে যাই বাল্যকালে, স্বপ্নের ভুবনে।

www.BDeBooks.Com

গল্প

মহৎ কৃপণের কাহিনী
টাকা দিন
গাড়লস্তানে এক বিকেল

মহৎ কৃপণের কাহিনী

আমাদের ছোটো, লোকে থইথই, গ্রামটিতে তার বদনামের কোনো শেষ ছিলো না। শুধু আমাদের গাঁয়েই নয়, পাশের এবং তার পাশের সবুজ সবুজ গ্রামগুলোতেও পৌঁচেছিলো তার কিপটেমির পাঁচ-ছশো গল্প। তার পুরো নাম কী ছিলো কেউ জানে না। হয়তো তার নাম ছিলো আবদুল বারেক শেখ, অথবা আবদুল বারেক মোল্লা বা ঢালি। কিন্তু তার পুরো নাম কেউ কখনোও বলে নি। বুড়ো-শিশু-যুবক সবাই তাকে বলতো কিপটে বারেক। তার নাম বলার সময় শিউরে উঠতো সবাই। তার মতো এতো বড়ো কৃপণ নাকি কোনো কালে কোনোদেশে জন্মে নি। তার নিন্দায় সে কখনো রাগ করতো না। তার সামনেই যখন কেউ তাকে কিপটে বলতো সে শুধু একটু মুচকি হেসে নিজের কাজে মন দিতো।

তাকে আমি প্রথম দেখি ইস্কুলে যাওয়ার পথে। এর আগে তার অনেক গল্প আমি বাড়ির অনেকের মুখে শুনলেও তাকে দেখি নি; কেননা বাড়ির বাইরেই যেতে দেয়া হতো না আমাদের মত ছোটোদের। সে বছর আমি প্রথম ইস্কুলে যাওয়া শুরু করেছি; স্বাধীনতা পেয়ে গেছি অনেকখানি এবং মুখোমুখি হচ্ছি অনেক চমৎকার চমৎকার মনে রাখার মতো ঘটনার।

সেদিন আমি অনেকখানি, পানি ভেঙে ইস্কুলের সড়কে উঠেই দেখি একটি লোক একটি বিরাট ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে। তার আগে আগে চলছে সাত আটটি গরু, ভীষণ স্বাস্থ্য। অমন চমৎকার গরু আমি আমাদের গ্রামের আর কারো দেখি নি। গরুগুলোর মোটামোটা বাঁট দুধে যেন ফেটে পড়ছিল। মনে হচ্ছিলো হাত দিলেই ওইসব গরুর বাঁট থেকে নেমে আসবে শাদা দুধ, ঘন মাখন, সোনারঙের ঘি!

লোকটির মাথায় এলানো ছড়ানো দল ঘাসের বোঝা; তাই তার মাথা আর মুখ দেখা যাচ্ছিলো না। তার পরণে ছিলো একটি পুরোনো লুংগি, কোঁচা দেয়া। একটি গামছা দিয়ে তা শক্ত করে বাঁধা। তার গায়ে কোনো জামা ছিলো না, যদিও তখন মাঘ মাস। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো শিরশির ক'রে। তার গায়ে জামা ছিলো না বলে আমার চোখে পড়লো তার পিঠের এদিকে সেদিকে ফুটে বেরিয়েছে সোনালি পাটের দড়ির মতো সুন্দর শক্ত অনেকগুলো পেশী। অত্তোবড়ো একটা বোঝা মাথায় নিয়েও সে টলছিলো

www.BDeBooks.Com

না একটুও। এমন ভাবে সে চলছিলো যেন তার মাথায় কোনো ভারী বোঝা নেই; আছে শুধু একটা হালকা বকের পালক!

সে-ই যে বিখ্যাত বারেক কিপটে আমি বুঝলাম একটু পরেই।

উল্টো দিক থেকে আসা একজন ভদ্রলোক, হয়তো বাজারে যাচ্ছিলেন, গরুগুলোর পাশ কাটাতে কাটাতে বললেন, কীরে কিপটা বারেক, এতো টাকা করলি, একটা চাকর-অ রাখতে পারলি না?

চাকরের কী দরকার চাচা! বারেকের উত্তর শুনলাম।

ভদ্রলোক আর কী সব বললেন, কিন্তু কিপটে বারেক তার একটি গরুর লেজ নেড়ে হাডিল-অ হাডিল-অ বলে এগোতে লাগলো।

আমি তখন কিপটে বারেকের পেছনে পেছনে হাঁটছি, আর ভীষণ খুশি বোধ করছি। কেননা এতোদিন যার গল্প শুনেছি, সে আমার সামনে। কিন্তু তার মুখ তো দেখা হলো না। দৌড়ে সামনে গিয়ে উঁকি দিয়ে আমি তার মুখ দেখলাম। বেশ বড় শক্ত মুখ তার। আমাদের বাড়ির সবার মুখ যেমন নরম নরম তিব্বত পাউডার দেয়া, তেমন মুখ নয় তার। দাড়িও তার খোঁচাখোঁচা, অঘ্রাণের আমন ধানের খেতের মতো। কিছু দূর যাওয়ার পরে সে গরুগুলো নিয়ে সড়ক থেকে একটা মাঠে নেমে গেলো। মাঠের অপর পাড়েই তার বাড়ি।

আমি ভাবতে লাগলাম : এ-লোকটিই এতো কৃপণ? সে কেনো এতো কৃপণ? সে শুধু টাকা জমায়? ভালো জামা পরে না? পোলাও খায় না কোনোদিন। শুধু টাকা জমায় শুধু টাকা জমায়?

এরপরে একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো তার সাথে। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে একটা চায়ের দোকান ছিলো। সেখানে গ্রামের ভদ্রলোকেরা গল্প করতো। শুধু চা আর চা খেতো, বাকির খাতায় লিখে রাখতো। কিপটে বারেক অই চায়ের দোকানে আসতো না কোনোদিন। সে তো আর ভদ্রলোকের মতো দারোগোর সাথে ভাব করতে পারতো না, পত্রিকা পড়তে পারতো না, আর চা বলে যে কিছু আছে তাও জানতো না।

সেদিন আমার বেশ ক্ষিধে পেয়েছিলো। চায়ের দোকানের সামনে আসতেই আমার চোখে পড়লো বইঅমের ভেতর মোটা মোটা কুকিজ। পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা আছে দুটো; কিন্তু কুকিজের দাম এক আনা, অর্থাৎ চার পয়সা। চায়ের দোকানে তখন যারা ছিলো তাদের সবার সাথেই বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিলো। আমি আমার ডান হাতে পয়সা দু'টো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। সেদিকে দোকানি কয়েকবার তাকালো, বাবার বন্ধুরাও

তাকালো। একজন বললো : কীরে হুমান পয়সা নাই? তারপর তারা দারোগা পুলিশ কীসব বলতে লাগলো।

আমার ভীষণ খেতে ইচ্ছে করছিলো কুকিজ। মনে হচ্ছিলো, যদি এখন একটি কুকিজ খেতে পাই, তাহলে আমি সারাজীবন না খেয়ে থাকতে পারবো।

এমন সময় দেখি কিপটে বারেক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা কাচি, হয়তো ঘাস কাটতে যাচ্ছিলো।

আপনের নাম হুমান না, রাশু চাচার ছেইলে না? কিপটে বারেক আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তার বয়স তখন চল্লিশেরও বেশি। আমাকে বলছে, আপনি! আমি অবাক হলাম। অই বয়সে আমাকে কেউ আপনি বলতো না। তুমি, তুই বলতো।

বললাম : জি।

আপনার কী খাইতে মন চায়? সে জানতে চাইলো।

কুকিজ। আমি বললাম।

আপনার পয়সা নাই?

দু-পয়সা আছে, কিন্তু কুকিজের দাম যে এক আনা।

কিপটে বারেক বললো : আমার কুকিজ খাইতে মন চায়, পয়সা আছে দুইডা। আহেন আমরা ভাগাভাগি কইর‍্যা কিইন্না খাই?

দুজনে চার পয়সা দিয়ে একটা কুকিজ কিনলাম আমরা। অর্ধেক, অর্ধেকের বেশি, সে আমাকে ভেঙে দিলো; বাকিটা নিজে নিলো। আমি কুকিজ মুখে দিয়ে যে স্বাদ পেলাম, তা আজও লেগে আছে আমার ঠোঁটে, টাকড়ায়, গলায়, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে। আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন চায়ের দোকানের ভদ্রলোকেরা হই হই ক'রে উঠছিলো। নিন্দায় ঘেন্নায় তারা ফেটে পড়ছিলো।

আরে কিপটে বারেক, এ্যাকটা বাচ্চাপোলার লগে তুই কুকিজ ভাগাভাগি কইরা কিনলি? একজনে বললো। তর যে কই জায়গা অইব, কিপটা! বললো

আরেকজন।

আমাগো গেরাম থিকা তরে বাইর কইরা দিমু। অন্য একজন বললো।

বারেক ওসব কথায় কানই দিলো না। সে কুকিজের টুকরোটি লুঙ্গির কোচরে রেখে মাঠের দিকে যেতে লাগলো। আমি আধখানা কুকিজ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু বস্তু, খেতে খেতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

www.BDeBooks.Com

বারেকের এমন কিপটেমির, ভাগ ক'রে জিনিশ কেনার অজস্র গল্পে ছেয়ে ছিলো আমাদের গ্রাম। এমন কোনো কিছুতে সে টাকা ব্যয় করে নি, যা তার খুব দরকারি নয়। আর দরকারি জিনিশও সে কিনেছে অন্যের সাথে ভাগে। এটা সত্য তার অনেক টাকা ছিলো। কেনো থাকবে না? সে তো সারাদিন কাজ করতো। তার বলদগুলোর চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতো সে। সে কোনোদিন শহরে আসে নি, সে জানতো না গ্রাম ছাড়াও কিছু আছে পৃথিবীতে। সে কোনোদিন পাজামাও পরে নি। লুংগি, যাকে সে বলতো থামি, না পরলে নাকি, তার গায়ে পিঁপড়ে পিঁপড়ে লাগতো। গ্রামের লোকেরা তাকে মাঝেমাঝেই বিপদে ফেলতে চাইতো। অর্থাৎ টাকা চাইতো নানা অজুহাতে। বারেক দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু সে কোনো কাজে কিছুতেই টাকা দিতো না, যাতে অন্যরা টাকা দিতো না।

একবার আমাদের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়লো। সে বছর ধান হয় নি, ফলে টাকাও আসেনি ঘরে। বাবা তো কিছুই করতেন না। খুব দামি লুংগি আর জামা প'রে চায়ের দোকানে বসে গল্প করতেন, অন্যদের চা খাওয়াতেন। সে বছর ধান না হওয়াতে তিনি খুব মুশকিলে পড়লেন। তিনি খুব অস্থির আর উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগলেন কোরবানির দিন যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগলো। প্রত্যেক বছর আমাদের বাড়িতে একটি বড়ো গরু, কয়েকটি ছাগল কোরবানি দেয়া হয়। কিন্তু ও-বছর কিছুই দেয়া যাবে না। টাকা নেই।

মায়ের সাথে বাবার আলাপ শুনতাম মাঝেমাঝে।

এবার আর মান থাকব না। বাবা বলতেন।

ক্যান? মায়ের প্রশ্ন।

ট্যাকা নাই, কি যে করি। বাবা চিন্তিত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতেন।

কিপটে বারেকের বদনাম ছিলো সে কোরবানিও দেয় না। একবার নাকি সে একটি সুন্দর গরু কোরবানির জন্যে কিনেছিলো, কিন্তু তা আর কোরবানি দেয় নি। গরুটির কোমল চোখ হয়তো তাকে নিষেধ করেছিলো। তাই সে বলেছিলো : এমন গরু কোরবানি না দিয়া পাললে বেশি ছ'আব অইব।

গ্রামের লোক ক্ষেপে তাকে নানা রকম অপমানকর শাস্তি দিয়েছিলো। তাতে তার টাকা ব্যয় হয়েছিলো অনেক। কিন্তু তাতেও সে দুঃখ পায় নি, রাগ করে নি।

বরং বলেছিলো : গরুটা বড় সোন্দর, অনেক দুধ অইব।

সবাই রটিয়ে দিয়েছিলো বারেকের মত কিপটে আর হয় না।

বাবার অবস্থার কথা বারেক কার কাছে যেনো শুনেছে। একদিন সে আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এর আগে আর কোনোদিন সে আমাদের বাড়ি আসে নি। আমি তাকে দেখে দৌড়ে বাঙলাঘর খুলে দিলাম। তাকে বসার জন্যে অনুরোধ করলাম একটি চেয়ারে।

অইডায় ত আমি বইতে পারুম না। সে বললো।

অবাক হয়ে আমি বললাম : কেনো পারবেন না?

লেহাপড়া না জানলে চ্যারে বহন যায় না। একটু পরে বললো : চাচাজি, ভাগে কোরবানি দেঅন যায় না?

বাবা বললেন, হ, দেঅন যায়। ঠিক হয়ে গেলো যে ভাগে কোরবানি দেয়া হবে : একটি গরু। অর্ধেক-অর্ধেক। পরের বছর আমরা আবার বড়ো গরু একলাই কোরবানি দিয়েছিলাম। বারেক কোনো কোরবানি দেয় নি। তাহলে আগের বছর সে কেনো কোরবানি দিয়েছিলো? বাবাকে সাহায্য করার জন্য? ভদ্রলোকেরা যে ভাবে মহত্ত্ব দেখায়, সুবিধে বুঝে কিছু টাকা পয়সা দান ক'রে দাতা বা দানবীর হয়, সে তেমন পারতো না বলে? সে কি কৃপণ ছিলো, না কি তার বিপরীত?

আমাদের ইস্কুলের চাল একবার বোশেখি ঝড়ে উড়ে গেলো। টিনগুলো গিয়ে পড়েছিলো গ্রামের একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে। তিনি সেগুলোতে রঙ লাগিয়ে দোতলা ঘর বানালেন। আমরা সবাই জানতাম তা; কিন্তু বলতে পারতাম না। তিনি যে সম্ভ্রান্ত। চালহীন ইস্কুল ঘরে রোদ ঢুকতো কড়কড়ে, বিষ্টি নামতো ঝিরঝির ঝরঝর ক'রে। টাকার অভাবে হোগলার ছাউনি দেয়া হলো; কিন্তু রোদ তাতে মানলেও বৃষ্টি মানতো না। গ্রামের ভদ্রলোকদের সেদিকে চোখ ছিলো না।

কিপটে বারেক একদিন আমাদের ক্লাশ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্লাশ নিচ্ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক।

বারেককে দেখেই ছেলেরা কিপটে কিপটে ক'রে উঠল।

বারেক বোকার মত হাসতে হাসতে স্যারকে সালাম দিলো।

কী বারেক, তোমার ছেলের খবর নিতে এলে না কি? স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

না, চাচা; একটা কতা কইতে আইলাম। সে বললো।

স্যার দরজার কাছে গেলেন।

www.BDeBooks.Com

অনেকদিন ধইরা দেখতাছি ইস্কুল ঘরের চাল নাই। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে বললো।

কী আর করি, টাকা নেই। স্যার বললেন।

এবার আরো বিনত হয়ে পড়লো সে। যেনো সে এমন একটা কথা বলবে যা মাটির সাথে মিশে বলা দরকার।

সগলে ট্যাকা দিলে আমি কিছু ট্যাকা দিতে পারি চাচা। কথাগুলো বলার সময় মনে হলো সে যেনো একটা বড় অপরাধ করছে, তাই লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছে সে।

এরপরে আমাদের ইস্কুলের নতুন টিনের চাল উঠল। তার ব্যয়ের বারো আনাই বয়েছিলো কিপটে বারেক, যদিও সেবার খুব নাম হয়েছিলো আমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারি সাহেবের। তাঁর চেষ্টায়ই নাকি নতুন চাল উঠেছিলো ইস্কুলের, এমন কথা আমাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কঠিন বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় বলেছিলেন মাননীয় অতিথিরা। সে উৎসবে কিপটে বারেকের নিমন্ত্রণ হয় নি। তার সময়েরও অপচয় হয় নি।

কিপটে বারেক আর নেই। কিন্তু টিকে আছে তার কিপটেমির অজস্র গল্প।

তার কথা আমার বারবার মনে পড়ে। আমরা কেনো এখন কাছে পাই না কোনো কিপটে বারেককে, যে ছোটো ছেলের সাথে ভাগ করে কুকিজ খায়, অন্যের অসহায়তা কমানোর জন্যে ভাগে কোরবানি দেয়, ইস্কুলের ছাদ তুলতে এগিয়ে আসে। এখন তো চারপাশে দেখি শুধু সে-সব কৃপণদের যারা লুটে খেতে চায় সব কিছু। এরা দিনরাত জপ করে : এটা আমার ওটা আমার, সেটা আমার, সবই আমার, একা আমার। এখনকার কিপটেরা কোটি টাকা জমাতে চায় একা, কোনো উপকার করতে চায় না ভাগ ক'রেও। সব কিছু গ্রাস করতে চায় বিশাল মুখের গর্তে। কোনো কাজ করতে চায় না তারা, পেশিকে ক্রিমের মত নরম মসৃণ করাই তাদের লক্ষ্য।

এখন আমি অন্ততঃ আর একজন কিপটে বারেক চাই।

টাকা দিন

আমার বাবা ছিলেন প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক। তিনি রাড়িখাল প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়েছেন অনেক বছর। পড়িয়েছেন মাঝপাড়ার নড়োবড়ো ইস্কুলটিতে। উত্তর কামারগাঁর পাতার কুঁড়েরটিতে। অনেক বছর। তাঁর কাছে অনেকে পড়েছে। আমিও পড়েছি। তাঁর ছাত্রদের কেউ হয়েছে বড়ো অফিসার। কেউ ডাক্তার। অনেকেই হয়েছে চাষী। আমি, বাবার ছাত্র, হয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তখনো বাবা কোনো একটি নড়োবড়ো পাতার কুটিরে শিশুদের পড়ান।

ছেলেবেলায় বাবাকে বড়োবড়ো কই মাছ নিয়ে শ্রীনগর যেতে দেখতাম। বছরে দু-তিন বার যেতেন। কইমাছগুলো কী বড়ো! অতো বড়ো কইমাছ আমরা কখনো খাইনি। বাবা তো বড়ো কইমাছ নিয়ে যেতেন শ্রীনগর! বাবার এক মাসের বেতনের অর্ধেক ব্যয় হয়ে যেতো কইমাছ কিনতে। শ্রীনগরে থাকতো বাবার এক অফিসার।

বাবা, আমার ছেলেবেলায়, বছরে দু-বার যেতেন মুনশিগঞ্জ। মুনশিগঞ্জে যাওয়ার সময় নিতেন বড়ো একটা চিতল। চিতলটা কিনতে বাবার বেতনের এক মাসের টাকা ব্যয় হয়ে যেতো। মুনশিগঞ্জে ছিলো বাবার আরো বড়ো এক অফিসার।

ঢাকা যেতেন বাবা বছরে একবার। নিতেন একটা মস্ত রুই। তেল চকচকে। অতো তেল চকচকে রুই আমরা কখনো খাই নি। রুই কিনতে বাবা যেতেন বিলে। দিঘির পাড়ে গিয়ে কিনতেন রুইটা। কিনতে বাবার দু-মাসের বেতন খশ ক'রে শেষ হয়ে যেতো। বাবার মুখ বেশ উজ্জ্বল-করুণ দেখাতো। রুইটা নিয়ে বাবা যেতেন ঢাকা। সেখানে থাকতো বাবার সবচেয়ে বড়ো অফিসার। বাবা ঢাকা যাওয়ার পর সাত-আট রাত ধ'রে আমি রুইটাকে স্বপ্নে দেখতাম।

বাবা নড়োবড়ো পাতার কুটিরে অনেক বছর পড়ালেন। বছরে বছরে রুই আর চিতল আর কই মাছ কিনলেন। শ্রীনগর আর মুনশিগঞ্জ আর ঢাকা গেলেন। তাঁর চুল পাকলো। রাগ কমলো। শরীর নরম হলো।

বাবা চাকরি থেকে অবসর নিলেন। না, ঠিক অবসর নিলেন না। তাঁকে অবসর দেয়া হলো। তিনি আর পাতার কুটিরে যান না। নড়োবড়ো চেয়ারে বসেন না। নাম ডাকেন না।

www.BDeBooks.Com

এখন বাবার অবসর। বাবার কোনো কাজ নেই।

তবে একটা কাজ তিনি পেলেন। সেটা হলো তাঁর পেনসন, অবসরভাতা তোলার কাজ। তিনি যতো টাকা অবসর ভাতা পাবেন, তা শুনে আমি তাঁকে বলেছিলাম, ওই টাকাটা তুলতে যাবেন না। আমি আপনাকে দিয়ে দেবো।

বাবা বললেন, না, হক টাকা। তোলা উচিত।

তিনি শহরে এলেন অবসর ভাতা তুলতে। তিনি অফিসারের ঘরে ঢুকে কাগজপত্র বাড়িয়ে দিলেন। অফিসার কাগজপত্র পাশে সরিয়ে রাখলেন। অন্য দিকে তাকিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, ভাতা পাবেন টাকা দিন।

বাবা অবাক হলেন। তবু পকেট থেকে বের করে কটা টাকা দিলেন অফিসারের হাতে। অফিসার টাকাটা পকেটে রেখে খশ ক'রে কাগজে সই করলেন। খুব খুশি হলেন বাবা। তিনি বেরোবার জন্যে পা বাড়ালেন।

হঠাৎ বাবা দেখেন অফিসারের টেবিলটা একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে বলছে, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

বাবা টেবিলটার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে পা বাড়ালেন বেরোবার জন্যে।

পা তুলতে পারলেন না তিনি। ঘরের মেঝেটা একটা হাত বাড়িয়ে বললো, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

মেঝেটার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলেন বাবা।

বেরোতে চাইলেন তিনি। কিন্তু ঘরের টাইপরাইটারটা একটা হাত বাড়িয়ে বললো, ভাতা পাবেন, টাকা দিন। টাইপরাইটারটাকে খুশি করলেন বাবা।

তখন টিকটিক ক'রে উঠলো হলদে দেয়ালের টিকটিকিটা। লেজটাকে হাতের মতো বাড়িয়ে বলল, ভাতা পাবেন, টাকা দিন। টিকটিকিটার হাতে কয়েকটা নোট দিলেন বাবা।

এমন সময় মাথার ওপরে চমৎকারভাবে থেমে গেলো তিন হাতের পাখাটা। একটা হাত নাচের ভঙ্গিতে নেমে এলো বাবার দিকে আর পাখাটা ঘটাং ঘটাং ক'রে বললো, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

বাবা কয়েকটা টাকা দিলেন পাখাটাকে। গরম মাথাটিকে ও-ইতো ঠাণ্ডা রেখেছে এতোক্ষণ।

আলমারিটার পাল্লা খুলে গেলো। বাবা দেখলেন আলমারিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে একটা মস্ত হাত। বলছে, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

কয়েকটা টাকা দিলেন বুড়ো আলমারিটাকে। বাবা প্রায় দরোজার কাছে এসে গেছেন। বেরোবেন এখুনি। দরোজার পর্দাটা দুলে একটা হাত বাড়িয়ে বললো, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

বেশ গরিব পর্দাটা, ছিঁড়ে গেছে। ওর সত্যিই খুব দরকার টাকা। বাবা কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলেন পর্দাটার হাতে। এবার বেরিয়ে যাবেন বাবা। পাবেন তাঁর অবসর ভাতা। বেশ খুশি লাগছিলো তাঁর।

পা বাড়াতেই দরোজাটা জড়িয়ে ধরলো তাঁকে। দুটো শক্ত হাত বাড়িয়ে বললো, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

বাবা পকেটে হাত দিলেন। হায়! একটাও টাকা নেই আর। ফুরিয়ে গেছে সব। চোখ লাল করে শক্ত হাতে জরিয়ে ধরলো বাবাকে দরোজাটা।

মাথা ঘুরে দরোজায় পড়ে গেলেন বাবা। তখনো শুনছিলেন তিনি দরোজাটা বলছে, ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

দরোজার পরে টুলটা বলছে, ভাতা পাবেন, টাকা দিন। ভাতা পাবেন, টাকা দিন।

www.BDeBooks.Com

গাড়লস্তানে এক বিকেল

তখন আমি খুব ছোটো ছিলাম। একটি ছোটো স্বপ্নের মতো ছোটো ছিলাম। আমি খুব স্বপ্ন দেখতাম। ঘুমিয়ে পড়লে তো কথাই নেই। আমার চোখের সামনে দুলে উঠতো, নেচে উঠতো, বেজে উঠতো নানা রকমের স্বপ্ন। কোনোটি লাল, কোনোটি নীল। কোনোকোনো স্বপ্নের খুব লম্বা ডানা থাকতো, কোনোটার থাকতো রঙধনুর মতো পেখম। জেগেজেগেও দেখতাম স্বপ্ন। একটা পাখি উড়ে গেলে মনে হতো স্বপ্ন উড়ে যাচ্ছে। পুকুরে একটা মাছ লাফ দিলে মনে হতো স্বপ্ন লাফ দিচ্ছে। দূরে মাঠে যখন রাখালেরা গান গাইতো মনে হতো কারা যেনো স্বপ্ন গাইছে।

তখন সব কিছু আমার বন্ধু ছিলো। আমাদের উঠোনের ডালিম গাছটা আমার বন্ধু ছিলো। তার লাল টুকটুকে ফুলগুলো ছিলো আমার মিতে। কৃষ্ণচুড়ো মরিচগাছের সাথে আমি বন্ধু পাতাতাম। পুকুরের ঢেউগুলোর সাথে কথা বলতাম। বলতাম, ঢেউ, তোমরা আমার বন্ধু হবে? তোমাদের মতো আমাকে দুলতে শেখাবে? ঢেউগুলো বলতো, আমরা তো তোমার বন্ধুই। তাই তো পুকুরের ওপার থেকে শুধু তোমার পারে আসি। তখন সব কিছু আমার বন্ধু ছিলো, মিতে ছিলো, বান্ধব ছিলো। ওরা আমার সাথে বলতো কতো মনের কথা।

ছিলো একটা দইকুলি। দোয়েল। থাকতো আমাদের ছোটো আম গাছটায়। ফকফকে শাদা তার বুক। সবচেয়ে মিষ্টি স্বপ্নের মতো ছিলো দোয়েলটি। আমি বলতাম দইকুলি। আমার দু-মুঠোর মধ্যে এসে সে বসতো। আমার কাঁধের ওপর চড়ে সে ট্রিকট্রিক কথা বলতো। আমার মাথায় উঠে ঠোঁট দিয়ে চুল আঁচড়ে দিতো। ওই দইকুলিটাই ছিলো আমার মনের মিতে। বুকের বন্ধু। অন্তরের বান্ধব।

এক দুপুরবেলা যখন মা ঘুমিয়ে বাবা ঘুমিয়ে তখন তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি আমার হারানো মারবেলটা খুঁজছিলাম আমগাছটির নিচে। দেখি দইকুলিটি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। মনে হলো যেনো আমি ঘুমিয়ে গেছি, স্বপ্ন দেখছি।

তুমি খুব স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসো? দইকুলিটি ডাল থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, খুব।

দইকুলি বললো, কী স্বপ্ন তোমার ভালো লাগে?

আমি বললাম, সব স্বপ্নই আমার ভালো লাগে। লাল স্বপ্ন, নীল স্বপ্ন। নদীর স্বপ্ন, পাহাড়ের স্বপ্ন।

দূরের স্বপ্ন তোমার কেমন লাগে? জানতে চাইলো দইকুলি।

আমি বললাম, ভিশশন ভালো লাগে। নদীর ওপারের স্বপ্ন, মাঠের সে-পারের স্বপ্ন, মেঘের অন্য ধারের স্বপ্ন দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।

দইকুলি বললো, আমি তোমাকে দূর থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারি। স্বপ্নের দেশে নিয়ে যেতে পারি। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি, নেবে নেবে আমাকে? একখুনি নেবে ওই মেঘের ওপারে?

দইকুলিটা নেমে এলো ডাল থেকে, বসলো আমার হাতের মুঠোয়। একটা ছোট মিষ্টি ঠোকর দিলো, এবং উড়ে বসলো মাটিতে। আমি অবাক হয়ে দেখি বড়ো হয়ে যাচ্ছে দইকুলি : বড়ো হচ্ছে, বড়ো হচ্ছে। তার ডানা বড়ো হচ্ছে, পা বড়ো হচ্ছে, ঠোঁট বড়ো হচ্ছে। দইকুলি বড়ো হচ্ছে। তার বড়ো হওয়া আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো। যেমন আমি কয়েক দিন আগে স্বপ্নে একটা ঝাউগাছ হয়ে গিয়েছিলাম, তারপরই হয়েছিলাম একটা বিরাট সূর্য।

আমি খুশিতে টগবগ ক'রে বললাম, দইকুলি, দইকুলি, তুমি বড়ো হচ্ছো।

দইকুলি বললো, তোমার ভালো লাগছে? তুমি ভয় পাচ্ছো নাতো?

আমি বললাম, খু-উ-ব ভালো লাগছে। আর ভয় আমি কখনোই পাই না।

দইকুলি তখন বেশ বড়ো হয়ে গেছে। একটা গোলগাল উড়োজাহাজের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তবে সে উড়োজাহাজের চেয়ে অনেক সুন্দর, অনেক মিষ্টি।

দইকুলি বললো, তুমি আমার পিঠে ওঠো। চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

আমি তার পিঠে উঠে বসলাম। তার পিঠটি রেশমের গদির চেয়েও নরম। সে তার ডানা দিয়ে দু-দিকে ঘিরে ফেললো আমাকে।

আমি তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। দইকুলি উড়ে চললো আকাশে।

www.BDeBooks.Com

এভাবে তার পিঠে চ'ড়ে আমি কতো ঘুরে বেড়িয়েছি আকাশ থেকে আকাশে। পদ্মার পশ্চিম পারে সূর্যটা যেখানে থকথকে লাল কাদার মতো গ'লে যায়, একবার গিয়েছিলাম সেখানে। আমি দু-হাতে গলা সূর্যটাকে ভীষণভাবে নেড়ে দিয়েছিলাম। যেনো রঙের বাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি হাত। সূর্য থেকে রঙ নিয়ে ভেজা রঙ এদিকে মেখে দিলাম, ওদিকে মেখে দিলাম। অনেকখানি রঙ নিয়ে এসেছিলাম সূর্যটা থেকে, মেখে দিয়েছিলাম আমার পড়ার টেবিলটায়। আমার হাতে অনেক দিন লেগে ছিলো সূর্যের গলানো রঙ। একবার অনেক উঁচুতে উঠে নীল আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিলাম। সেদিন আকাশটা ছিলো খুব ভেজা। আকাশের রঙ লেগে আমার চুলগুলো নীল হয়ে গিয়েছিলো। চোখের তারায় একটু নীলরঙ লেগে গিয়েছিলো। দইকুলি আমাকে অস্ত-সূর্যের কাছে নিয়ে যেতো, ভিজে নীল আকাশের কাছে নিয়ে যেতো। একবার নিয়ে গিয়েছিলো সাগরের ঢেউয়ের ওপরে। আমরা দু-জন বসেছিলাম একটা ঢেউয়ের ওপর। দুলতে দুলতে চ'লে গিয়েছিলাম পৃথিবীর একেবারে পশ্চিম পারে। আরেকটু হ'লেই নাকি আমরা দুজন গড়িয়ে পৃথিবী থেকে প'ড়ে যেতাম।

এভাবে দইকুলির পিঠে চেপে আমি দেখেছি কতো আকাশ। দেখেছি কতো চাঁদ আর সূর্য। দেখেছি একহাজার মাইল লম্বা ঢেউ, দেখেছি সবুজ রঙের মেঘ, আংটির মতো চাঁদ, সাগরের মতো পদ্মফুল। একটি গোপন ঝরণা দেখেছি, যার থেকে দিনরাত ঝ'রে পড়ছে সোনার জল। দেখেছি দিন আর রাত কী ক'রে মিশে থাকে একে অপরের সাথে। দেখেছি একই আকাশে ভাসছে সাতটি চাঁদ, আলো দিচ্ছে চোদ্দটি সূর্য। দেখেছি আকাশ দিয়ে সাঁতার দিয়ে যাচ্ছে মাছ, পানির নিচে কলকল করছে পাখির ঝাঁক। পরিদের শাড়ি বানাতে দেখেছি রঙধনু থেকে সুতো তুলেতুলে।

দইকুলি আমাকে নিয়ে গেছে কতো স্বপ্ন থেকে স্বপ্নের ভেতরে।

সেদিন বিকেলে দইকুলি আমাকে ডাকলো, ট্রিকট্রিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ কোন স্বপ্নে যাবো?

দইকুলি বললো, তোমাকে আজ নিয়ে যাবো এক চমৎকার দেশে। এমন দেশ আর কোথাও নেই।

আমি কলকল ক'রে উঠলাম, তাহলে চলো, এখুনি চলো। দেখে আসি দেশটা।

দইকুলি বললো, পিঠে ওঠো।

আমি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, দেশটার কী নাম?

দইকুলি ট্রিক করে বললো, গাড়লস্তান।

বাহ। কী সুন্দর নাম গাড়লস্তান! আমার মন নেচে উঠলো! আজ নিশ্চয়ই যাবো এক মজার দেশে। যার মতো দেশ আর নেই। দইকুলি বললো, তুমি যা দেখবে তাতেই শুধু অবাক হবে।

আমি বললাম, তাই তো চাই। খুব অবাক হতেই তো চাই।

উড়ে চললো দইকুলি : আমার বন্ধু উড়োজাহাজ। অনেক মেঘ পেরোলাম, দুটো সূর্যকে ডুবতে দেখলাম, তিনটি চাঁদ উঠতে দেখলাম। শেষে এসে পৌঁছোলাম তুলনাহীন গাড়লস্তানে। গাড়লস্তানে তখন ভোর হয়েছে; সূর্যটা পশ্চিম দিক থেকে উঠছে। আলোটা একটু অন্য রকম, কালচে কালচে।

দইকুলি বললো, তুমি একটু ঘুরে দেখো আমি একটা ডালে ব'সে জিরোই।

আমি বললাম, একটু ঘুমিয়ে নিয়ো।

মুচকি হেসে দইকুলি একটা ডালে গিয়ে বসলো। আমি ঘুরে দেখতে চললাম।

বাহ্ কী চমৎকার! বাহ্ কী চমৎকার দেশ! সব কিছুই তো অবাক করছে আমাকে। বন্ধু দইকুলি তো একটুও বানিয়ে বলে নি। সব বলেছে খাঁটি সোনার মতো কথা।

ওই একটু দূরে রাস্তার পাশে সারিসারি ব'সে কী করছে গাড়লস্তানের লেকেরা? কী করছে তারা ড্রেনের পাশে বসে? আমি এগিয়ে গেলাম। কী চমৎকার মজার কাণ্ড করছে তারা।

অনেকগুলো লোক এসে বসেছে রাস্তার পাশে। ড্রেন দিয়ে খুব ময়লা বয়ে যাচ্ছে। মড়া ইঁদুর, বেড়াল, থকথকে কাদা, আর সব বিচ্ছিরি জিনিশ বয়ে যাচ্ছে ড্রেন দিয়ে। লোকগুলোর প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্ক্রু-ড্রাইভার। আমি দেখলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তারা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুলে ফেলছে নিজ নিজ মাথার খুলি। যেমন টুপি খোলে তেমনভাবে খুলছে তারা নিজ নিজ খুলি। দেখে খুব অবাক হলাম।

তারপর দেখি তারা মাথার ভেতর থেকে মুঠো ভ'রে তুলে আনছে মগজ। ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এদিকে ওদিকে। তারপর মুঠো ভ'রে ড্রেন থেকে ময়লা তুলে ভরে দিচ্ছে মাথার খুলি। যে যতো বিচ্ছিরি ময়লা মাথায় ভরতে পারছে সে খুশি হচ্ছে ততো। মাথায় ময়লা ভরছে আর খুশিতে খিলখিল

www.BDeBooks.Com

ক'রে উঠছে। তারপর ময়লায় মাথা ভ'রে গেলে খুলিটা আবার লাগিয়ে খুশিতে খিলখিল হয়ে চ'লে যাচ্ছে যে যার পথে। কী চমৎকার কাণ্ড।

গাড়লস্তানে সারিসারি লোক মাথার মগজ ফেলে ময়লা ভরছে খুলিতে।

আমি একজনের কাছে গিয়ে বললাম,আচ্ছা ভাই, শুনুন।

বাগবাগ হয়ে তিনি বললেন, বলুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা মগজ ফেলে মাথায় ময়লা ভরছেন কেনো?

লোকটি খিলখিল ক'রে উঠলো। বললো, হাসালেন ভাই, হাসালেন। ময়লা না ভরলে কি চলে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেনো চলে না?

তিনি বললেন, মগজ থাকলেই মাথা ব্যথা করে, ভাবতে ইচ্ছা হয়। মগজ না থাকলে কোনো ভাবনা নাই।

খিলখিল ক'রে হাসতে লাগলেন তিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দেশে সবার মাথায়ই কি ময়লা আবর্জনা?

তিনি বললেন, ঠিক ধরেছেন, ঠিক ধরেছেন। আমাদের কারো মাথায় মগজ নাই। ময়লা আর আবর্জনায় মাথা ভ'রে ফেলেছি। তাই তো আমরা এতো ভালো আছি।

খুব ভালো আছে গাড়লস্তানের গাড়লেরা। মাথায় মগজ থাকলে কেউ ভালো থাকতে পারে না, শুধু মাথা ব্যথা করে। আর সেখানে থাকে যদি মড়া বেড়াল, পঁচা ইঁদুর, প্যাঁককাদা, তাহলে খুব ঠাণ্ডা থাকে মাথা। তাই তো বেশ ঠাণ্ডা গাড়লদের মাথা।

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মাথায় ক-সের আবর্জনা আছে, আপনি জানেন?

খুব উল্লসিত হলো সে, যেনো মহান আনন্দে ফেটে পড়বে।

বললো, আমাদের দেশে যে যতো বড়ো রাজকর্মচারী তার মাথায় ততো বেশি ময়লা। ইস কী যে ভাগ্য তাদের। কতো ময়লা তাদের মাথায়।

একটু যেনো ব্যথিত হলো সে শেষ দিকে। তার মাথায় দশ-বারো সের আবর্জনা নেই বলে কী যে দুঃখ তার! থাকলে সে আরো কতো উঁচুতে উঠে যেতে পারতো।

আমি বললাম, আপনাদের রাজাবাদশারা কিন্তু চমৎকার।

শুনেই পুলকিত হয়ে উঠলো সে। খুব চঞ্চল আর গর্ববোধ করতে লাগলো।

বললো, জানেন আমরা যারা ছোটো গাড়ল তাদের মাথায় কম ময়লা। যারা বড়ো গাড়ল তাদের মাথায় বেশি ময়লা। কিন্তু আমরা জন্ম নিই মগজ নিয়ে।

একটু থেমে বললো, পরে মগজ ফেলে সেখানে ভ'রে নিই আবর্জনা।

একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললো, আর আমাদের রাজাবাদশা যারা তাদের জন্মের সময়ই মাথার মধ্যে থাকে মন-মন ময়লা আর আবর্জনা। তাই তো তারা রাজা।

কেননা তাদের মাথায় কখনোই মগজ ছিলো না। কথা বলতে বলতে বিনয়ে শ্রদ্ধায় ভ'রে গেলো তার বুক। মাথা নুইয়ে সে সম্মান জানালো অনুপস্থিত রাজাবাদশাদের। খুব ভালো লাগলো আমার; সত্যিই মগজ না থাকলে কী যে ভালো থাকে সব কিছু। ওই যে গোলাপ ফুলটি, কী সুন্দর, ওর কি মগজ আছে? ওই মেঘের কী মগজ আছে? আমাদের ধোপার গাধাটির কি মগজ আছে তাই তো সে কী চমৎকার। আহ্, আমার যদি মগজ না থাকতো। এতো মাথা ধরে আমার!

হাঁটতে হাঁটতে দেখি এসে পড়েছি তরুণ গাড়ল বক্র বিদ্যালয়ের দরোজায়। একটু কি ঢুকে দেখবো কী হচ্ছে সেখানে? ভীষণ চমৎকার ইস্কুল, মনে হয় যেনো হোটেল। আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দেখি বার্ষিক ফল বেরোচ্ছে। হেডমাস্টার ফল ঘোষণা করছেন। আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হেডমাস্টার ঘোষণা করলেন, এই মোহাম্মদ আহম্মদ গাড়ল। তুমি সব বিষয়ে পেয়েছো শূন্য : অঙ্কে শূন্য, রংকে শূন্য, ঢংকে শূন্য...। এতো শূন্য আর কেউ পায় নি।

সবাই হাত তালি দিতে লাগলো। একটি মেয়ে মালা পরিয়ে দিলো মোহাম্মদ আহম্মদ গাড়লের গলায়।

হেডমাস্টার বললেন, তাই তুমি এই ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছো। তুমি আমাদের গৌরব। করতালিতে মুখরিত হ'য়ে উঠলো চারদিক। কী উজ্জ্বল সকলের মুখ।

শূন্য যারা পেয়েছে তারা হ'তে লাগলো ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। অনেক নাম ঘোষণার পর একসময় কেমন রাগীরাগী হ'য়ে উঠলো হেডমাস্টারের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল। আমি ভয় পেলাম; কী হলো, কে অপরাধ করলো?

www.BDeBooks.Com

গর্জে উঠলেন হেডমাস্টার, এই অরুণ, তুমি আমাদের স্কুলের কলঙ্ক।

সবাই আমরা ভীত হ'য়ে উঠলাম, ভয়ে কাঁপতে লাগলো কোণে বসা একটি ছেলে।

হেডমাস্টার গর্জন ক'রে চললেন, তুমি, তুমি সব বিষয়েই একশো পেয়েছো। তাই তুমি ফেল। তোমার মাথায় কোনো আবর্জনা নাই।

কেঁপেকেঁপে কেঁদে উঠলো ছেলেটি।

খুব ভালো লাগলো আমার। এমন সোনার দেশ আর হয় না। শূন্য পেলে ফার্স্ট আর একশো পেলে ফেল। সত্যি, এমন দেশ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আকাশে না, পাতালে না।

একটু দূরেই একটা চমৎকার ভবন। ছাদের ওপর সোনায় বানানো একটি ভাস্কর্য। একটি লোক তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে ফেলেছে আরেকজনের, ভাস্কর্যটিতে রূপ পেয়েছে সে-ঘটনা। আমি শুনেছি স্বর্ণাক্ষরেই লেখা হয় কিছু কিছু জিনিশ, সোনাদিয়ে যে মূর্তি বানানো হয়, তাতো জানতাম না।

ওটা আমাদের বিচারালয়। একজন গাড়ল জানালো আমাকে।

আমি হেঁটেহেঁটে ভেতরে ঢুকলাম। কোঠায় কোঠায় বিচার হচ্ছে। উকিলে-বিচারপতিতে-আসামীতে-গাড়লে ভরা চারপাশ।

বিচার হ'তে একটুও সময় লাগে না।

আসামী আসছে আর বিচার হচ্ছে।

এক ঘরে বিচারপতি আসামীকে জিজ্ঞেস করছেন, বলো তোমার কী অপরাধ? আসামী সগর্বে বললো, আমার কোনো অপরাধ নাই। আমি মাত্র দশজন গাড়ল খুন করেছি।

লোকজন খুব খুশি হয়ে উঠলো চারপাশে। আমি শিউরে উঠলাম, দশজনকে খুন?

উকিল বললো, বিচারপতি, এর কোনো অপরাধ নাই। মাত্র দশজনকে খুন করেছে।

বিচারপতি ঘোষণা করলেন, আসামী নির্দোষ। তাকে অবিলম্বে মুক্তি দাও।

আরেক ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। জমজমাট বিচার চলছে সে-ঘরে। আসামীর কোনো রক্ষা নেই।

বিচারপতি জিজ্ঞাস করলেন, বলো তোমার কী অপরাধ?

আসামী মাথা নিচু ক'রে রইলো, তার গলা আটকে আসছে, চোখে পানি টলোমল।

সরকারি উকিল বললো, এ-আসামী ভয়ঙ্কর অপরাধী। তাই কথা বলছে না। বিচারপতি চশমাটি ঠিক ক'রে পরলেন।

উকিল বললো, বিচারপতি, এর মতো পাষণ্ড সারা গাড়লস্তানে পাওয়া যাবে না। এর অপরাধের কোনো সীমা নেই।

আসামীর পক্ষের উকিল বললো, না, না, বিচারপতি, আমার গাড়ল কোনো অপরাধ করে নাই।

সরকারি উকিল বললো, অবশ্যই সে অপরাধ করেছে। সে একজন গাড়লকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যখন অন্যরা গাড়লটিকে খুন করতে চেষ্টা করছিলো, তখন এ-পাষণ্ডটি তাদের বাধা দিয়েছে।

আসামী পক্ষের উকিল বললো, না বিচারপতি, এ-অভিযোগ সত্যি নয়। আমার গাড়ল কাউকে বাঁচাতে চেষ্টা করে নি, সে খুন করার চেষ্টা করেছে।

সরকারি উকিল বললো, না, সে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে।

বিচারপতি রায় দিলেন, এ-আসামী অত্যন্ত পাষণ্ড। সে খুন করতে চেষ্টা করে না, বাঁচাতে চায়। এটা গর্হিত অপরাধ। তাই আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

আরেক ঘরে বিচার চলছিলো মারাত্মক অপরাধের।

অপরাধী একটি মারাত্মক অপরাধ করেছে।

সে সত্য কথা বলেছে।

সত্য কথা বলা অপরাধ গাড়লস্তানে। মিথ্যে বললে মিলে পুরস্কার। আর সত্যি বললে দশ বছর কারাদণ্ড। একজন অপরাধীকে সত্য কথা বলার অপরাধে দেয়া হলো কারাদণ্ড। আরেকজনকে নির্দোষ ঘোষণা করা হলো, কেননা সে মিথ্যে বলে। দেখে মাথাটা একটু টনটন করে উঠলো আমার। ভাবলাম একটু আবর্জনা ঢুকিয়ে নিই মাথায়।

একটি রাস্তায় দেখি গাড়ি আর গাড়ি। তারপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর বাড়ি। অতো সুন্দর গাড়ি আর আমি দেখি নি, অতো সুন্দর বাড়িও দেখি নি। মুগ্ধ হ'য়ে গাড়ি গুণতে লাগলাম। বাড়ি দেখতে লাগলাম।

গাড়ি আর বাড়ি দেখছি দেখে একজন গাড়ল এসে পাশে দাঁড়ালো।

আমি বললাম, কী সুন্দর গাড়ি!

সে খুব খুশি হলো। বললো, গাড়লেরা গাড়ি চড়ে। গাড়লেরা গাড়ি চড়ে।

www.BDeBooks.Com

আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম, গাড়লেরা গাড়ি চড়ে।

সে এর সাথে মিলিয়ে একটি ছড়া বানালো, গাড়লেরা বাড়ি করে।

ওই সুন্দর বাড়িগুলোতে থাকে বড়োবড়ো গাড়ল; ওই সুন্দর গাড়িগুলো চড়ে বড়ো বড়ো গাড়ল। কিন্তু ওইগুলোতে থাকে কারা? ওই যে দূরে ভূতুড়ে বাড়ির মতো, নড়োবড়ো, ময়লা, ঘিনঘিনে বাড়িগুলো? ওখানকার গাড়লগুলোও দেখতে বিচ্ছিরি। মনে হয় দিনের পর দিন না খেয়ে আছে। তাদের পোশাকগুলোও কেমন নোংরা। কিন্তু বড়োবড়ো গাড়লরা দেখতে কী সুন্দর যেনো চর্বি তেল হ'য়ে বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে গাল থেকে। তাহলে কি যার মাথায় যতো আবর্জনা তার দেহে ততো চর্বি? ততো তেল? চমৎকার সব কিছু গাড়লস্তানে।

ওখানে থাকে কারা? ওখানে যারা থাকে তারা কারা?

আমি একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ভাই, ওই নোংরা বাড়িগুলোতে কারা থাকে?

সে একটু অবাক হলো? বললো, কেনো, ওই যে যাদের দেখছেন, তারা থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তারা কারা? তারা এতো নোংরা বাড়িতে থাকে কেনো?

গাড়লটি অবাক হলো। বললো, থাকবে না নোংরা বাড়িতে? থাকবে না কেনো?

আমি অবাক হলাম। সে একটু দম নিয়ে বললো, ওখানে থাকে তারা যাদের মাথায় মগজ আছে। মাথায় যদি মগজ থাকে তবে গাড়লস্তানে নোংরা বাড়িতে থাকতেই হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেনো, কেনো? মগজের কী দোষ?

সে বললো, সব দোষ মগজের। মগজ থাকলেই ভাবনা হয়, ভাবনা হ'লেই চিন্তা হয়, চিন্তা হ'লেই সব শেষ, থাকতে হয় নোংরা বাড়িতে। থাকতে হয় না খেয়ে।

আর মগজ না থাকলে? আমি জানতে চাই।

না থাকলে তো রাজাবাদশা। আর থাকার পর যদি ফেলে দিয়ে সেখানে আবর্জনা ভ'রে নেয়া হয়, তবে বাড়ি আর গাড়ি, পোলাও আর মাংস, এবং আরো কতো কী!

সে বাগবাগ হ'য়ে বলে যেতে লাগলো মাথায় আবর্জনা থাকলে কী কী মেলে গাড়লস্তানে। আমি আমার মাথার ভেতরের মগজটা নিয়ে মুশকিলে পড়তে শুরু করলাম। দেখি ওটা ভাবতে শুরু করলো। তারপর শুরু করলো চিন্তা। তারপর ব্যথা করতে লাগলো।

সত্যিই তো বলেছে সে। মগজেরই সব দোষ।

কিন্তু গাড়লস্তানে এতো কুকুর কেনো? বাড়ির সামনে কুকুর, রাস্তায় কুকুর, মাঠে কুকুর, দালানে কুকুর, এখানে কুকুর, ওখানে কুকুর। আর দেখতে কী সুন্দর! তেল চকচক করে, একটুতে কান ফুলে ওঠে, নাক ফুলে ওঠে। কুকুরগুলোর গায়ে আবার তারা আক্য।

লাল লাল চোখে তাকায়। আমার খুব ভালো লাগলো। আমার একটি মিনমিনে কুকুর আছে, ওটাকে পিটোলে কেঁইকেঁই করে সুর তোলে আর পায়ে পড়ে। কিন্তু এগুলো কেমন নির্ভয়। দেখলেই পথ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

এতো সুন্দর কুকুর যে-দেশে আছে, সে-দেশের মতো আর কী দেশ হয়? আমি মুগ্ধ হয়ে পথে পথে কুকুর দেখতে লাগলাম। ওরা কিভাবে পা ফেলে কিভাবে হুংকার দেয় শিখতে লাগলাম। যাতে ফিরে গিয়ে আমার মিনমিনে কুকুরটাকে সব কিছু শেখাতে পারি।

একটুও যাতে ভুল না হয়।

কে একজন এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এতো মন দিয়ে কী দেখছেন?

আমি বললাম, কুকুর দেখছি। এতো সুন্দর কুকুর আপনাদের। আপনাদের চেয়ে সুন্দর আপনাদের কুকুর।

কথা শুনে সে গদগদ হয়ে উঠল। বললো, সত্যি বলেছেন আপনি। কুকুরই তো আমাদের সব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতো কুকুর দিয়ে কি করেন আপনারা?

সে অবাক হলো একটু। বললো, কী যে বলেন আপনি! কুকুর দিয়ে কী করি! কুকুর পুষতে আমরা ভালোবাসি।

আমি বললাম, আমিও ভালোবাসি কুকুর। কিন্তু

সে একটু ঘাবড়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কী?

আমি বললাম, কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা কুকুর ভালোবাসেন না। বরং ভয় পান।

www.BDeBooks.Com

সে বললো, আস্তে কথা বলুন। কুকুরেরা শুনে ফেলবে। খুব রেগে যাবে। সে ফিসফিস করতে লাগলো।

তারপর ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, জানেন, সত্যি আমরা কুকুরকে ভয় পাই। এক সময় আমরা কুকুরগুলো পুষতাম। এখন কুকুরগুলোই আমাদের পোষে।

সে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চ'লে গেলো। আমি মাথার ব্যথায় ব'সে পড়লাম একটা গাছের নিচে। দেখি আমার দইকুলি ঢিক ক'রে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। সে গোলগাল উড়োজাহাজ হ'য়ে গেলো, আমি উঠে বসলাম তার পিঠে। আকাশের মেঘ লেগে আমার মাথাটা ঠাণ্ডা হলো। সূর্যের আলো লেগে আমার চোখ আবার দেখতে পেলো।

দইকুলি জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো গাড়লস্তান?

আমি মাথায় আরেকটু মেঘ মেখে নিলাম। আকাশ থেকে একটু নীল আঙুলে মেখে আমার গালে মাখলাম। মাথাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিলাম আমার পুরোনো মগজটা মাথার ভেতরে আছে কিনা।

দইকুলি আবার জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো গাড়লস্তান?

আমি বললাম, স্বর্গ, স্বর্গ।

দইকুলি উড়ে চললো সেদিকে যেদিকে আকাশে কালো মেঘ মাঠে সবুজ ঘাস বাতাসে নরম জলকণা।

আজ যখন তিরিশ বছর পর গাড়লস্তানে ভ্রমণের কথা মনে পড়ে, তখন শুধু মনে হয় : ওটা কি আমার স্বপ্ন ছিলো?

না-কি অন্য কিছু?

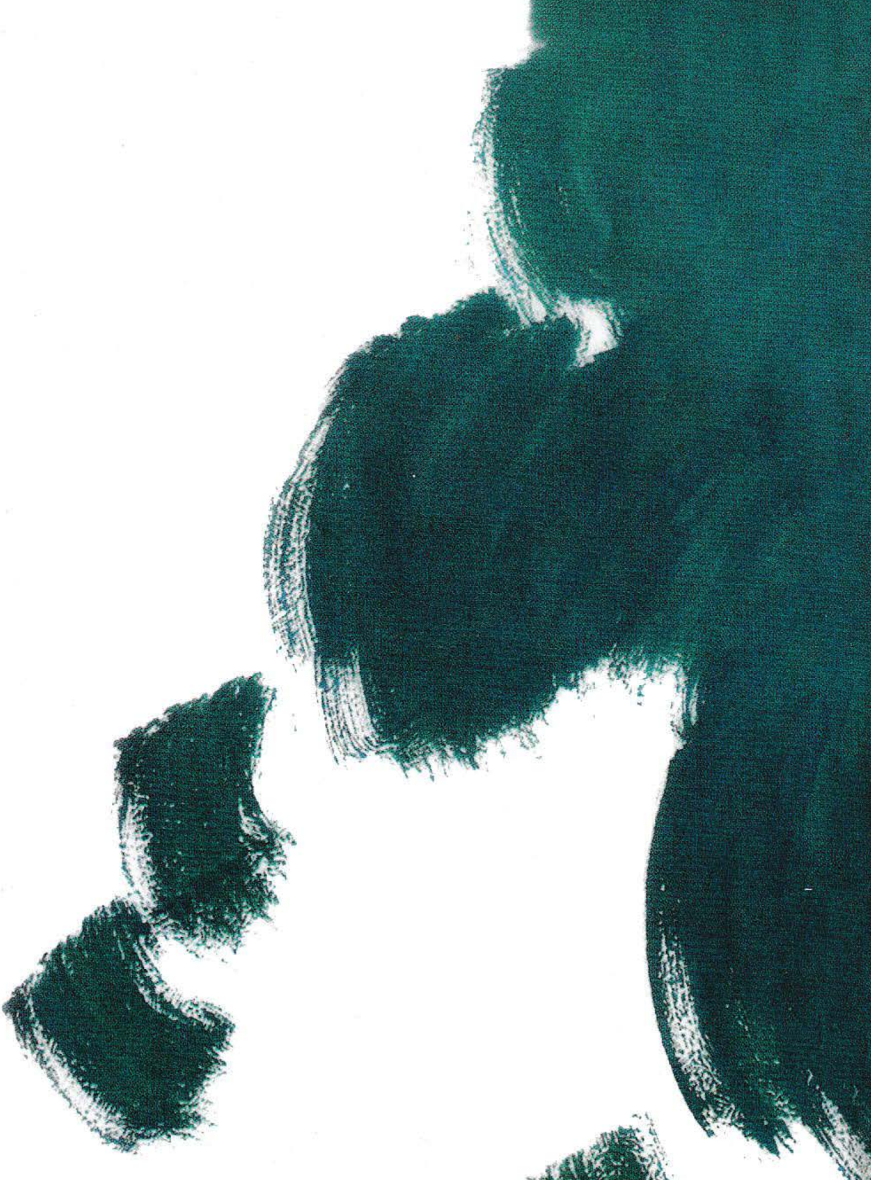

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com